সাম্যবাদ

মন্দার উৎস পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ৩ | কিউবা কেন পারে ৬ | ত্রাণ তৎপরতা ৭ | সচেতনতা কার্যক্রম ৮

www.spbm.org ● বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় মুখপত্র, এপ্রিল ২০২০

সহযোগিতা কার দরকার? কে পাচ্ছে?

শিশুটি রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে থাকে। মাস্ক নেই, তাই কাপড় দিয়েই ঢাকছে মুখ। ওদের স্বাভাবিক জীবনই মানবেতর। ঘনিয়ে আসা দুর্যোগে কী হবে তাদের, তারা তা জানে না। তাদের কথা কেউ ভাবছেও না এখন। দেশের অনেকেই এখন ভাবতে বসেছেন, এরা একটা বোঝা। তাই কারও শুভাকাঙ্ক্ষায়, কারও প্রার্থনায় তারা নেই। নির্মল এ শিশুটির চোখ যেন জিজ্ঞেস করছে, 'আমার কী দোষ বলতে পারো?'

ছবি: *এশিয়ান টাইমস্* থেকে নেয়া

যেকোনো দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রে পূর্ব প্রস্তুতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোভিড ১৯ সংক্রমণের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যক্ষেত্রেই শুধু নয়, সকল দিক দিয়েই বাংলাদেশ সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের দেশের সরকার সময় পেয়েছিল। কিন্তু সমাজের বিত্তবান শ্রেণিকে রক্ষার উদ্যোগ নেয়া ছাড়া সরকার আর কিছুই করেনি। সরকারের পক্ষ থেকে প্রথমে শিল্পপতিদের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার, এরপর আবার শিল্পপতি ও শিল্পউদ্যোক্তাদের জন্য ৬৭ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার, তারপর কৃষকদের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার এবং সর্বশেষ দিনমজুর, রিক্সাচালক, শ্রমিক ও হকারদের জন্য ৭৬০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রণোদনা প্যাকেজের বিশ্লেষণে না ঢুকে শুধু বরাদ্দের ক্রম অনুসরন করলে বুঝতে পারব যে, রাষ্ট্র কাকে কতটুকু গুরুত্ব দেয়।

গার্মেন্টস মালিকরা কি যৎসামান্য লাভ করে কোনরকমে ব্যবসা চালান?

অবস্থাদৃষ্টে এই কথাটা আসা অমূলক নয়। মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকেই যখন স্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্য কারখানাগুলোকে বন্ধ ঘোষণার দাবি উঠল, তখনই মালিকরা সবাই বিরাট লোকসানের বিবরণ দিতে শুরু করলেন। এ অবস্থায় কারখানা বন্ধ রেখে শ্রমিকদের বেতন দেয়া যে যাবেনা সেটাই তারা বিভিন্নভাবে তুলে আনলেন। তাদের সংগঠন বিজিএমইএ'র সভাপতি রুবানা হক বললেন যে, বায়াররা তাদের অর্ডার ক্যান্সেল করছেন, ফলে গার্মেন্টস খাত এক বিরাট সংকটের মধ্যে পড়ছে। সংকট মোকাবেলায় তখন প্রধানমন্ত্রী ৫ হাজার কোটি টাকার প্রনোদণা ঘোষণা করেন রপ্তানীমুখী শিল্পের মালিকদের জন্য। বলা হল কর্মচারী ও শ্রমিকদের বেতন দেয়ার উদ্দেশ্যেই কেবল এই টাকা ব্যবহার করা যাবে। এরপরও মার্চ মাসের বেতন পরিশোধ করা হয়নি অনেক জায়গায়। গত ১৬ এপ্রিল বণিকবার্তার এক রির্পোটে দেখা যাচ্ছে যে, ৭ ও ১০ এপ্রিল গাজীপুরের দুটি কারখানায় ৫৭৬ জনকে ছাঁটাই করা হয়েছে। একই রিপোর্টে শ্রম ও শিল্পসংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার বরাত দিয়ে বলা হচ্ছে 'শুধু গাজীপুর নয়, দেশের সব পোশাক কারখানায়ই কম-বেশি শ্রমিক ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা চলছে।' বাস্তবে 'রিট্রেঞ্চমেন্ট' অর্থাৎ যে শ্রমিক এক বছরের কম সময় ধরে কাজ করছে তাদের ছাঁটাই করে ব্যয় সংকোচন নীতি গ্রহণ করছে মালিকরা। যাদের চাকরির বয়স এক বছর হয়নি তাদের ছাঁটাই করলে মালিকদের কোনরকম ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। এরই মধ্যে বিজিএমইএ সভাপতি সকল কারখানাকে লে অফ হিসেবে গণ্য করার জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরের কাছে আবেদন করেছেন। সেখানে তারা শ্রম আইনের ১২ ও ১৬ নং ধারা স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। শ্রম আইনের ১২ নং ধারায় কারখানায় কাজ বন্ধ রাখা যাবে কী কী শর্তে তা দেয়া আছে। ১৬ নং ধারায় লে অফের নিয়মাবলী বর্ণিত আছে। তাদের দাবি অনুসারে *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

কৃষিতে প্রহসনের প্রণোদনা নয়–প্রয়োজন পরিকল্পনা, অনুদান

বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে মহামন্দার আভাস দিচ্ছেন অর্থনীতিবিদেরা। সংকট থেকে বাঁচতে এদেশীয় মালিকদের তাগাদায় ৭২ হাজার ৭৬০ কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করেছে সরকার। এতে মূলত বড় বড় ব্যবসায়ীরাই উপকৃত হবেন। অথচ এ পরিস্থিতিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার দরকার ছিল স্বাস্থ্যখাতে, সে বিষয়ে বক্তব্যই নেই। সারা দেশ তথা সারা বিশ্বের অচলাবস্থায় হুমকির মুখে পড়েছে কৃষিখাত, শুধু তাই নয় যথার্থ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা না হলে অদূর ভবিষ্যতে মরার উপর খাড়ার ঘা-এর মতো মহামারীর উপর দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। সেই অবস্থাতেও কৃষিখাতের জন্য কোনো বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হয়নি। পরবর্তীতে বিভিন্ন সংগঠনের সমালোচনার প্রেক্ষিতে কৃষিখাতের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়। বলা হয়েছিল এই টাকা ৫% হার সুদে ঋণ হিসেবে প্রদান করা হবে। পরে সমালোচনার প্রেক্ষিতে সেটা ৪% করা হয়।

শিল্পপতিদের জন্য সরকার যেমনি বিশাল অংকের প্রণোদনা দিয়েছে, তেমনি তাদের সুদের অর্ধেকের দায়িত্বও নিয়েছে। শিল্পের কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুদের হার মাত্র ২%।

দেশের অর্থনীতিতে একক খাত হিসেবে কৃষির অবদান সবচেয়ে বেশি, আবার এই কৃষিকাজের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত থেকে জীবনধারণকারী মানুষের *(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

কোভিড-১৯ ও আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা
দেড় মাস সময় পেয়েও অপ্রস্তুত, দিশাহারা

এটা বলতে কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয় যে, প্রস্তুতির জন্য বাংলাদেশ যথেষ্ট সময় পেয়েছিল। জানুয়ারির মধ্যেই সেটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে যায়। কিন্তু আমাদের দেশে এটি প্রথম ধরা পরে মার্চের ৮ তারিখে। বাস্তবে প্রায় দেড় মাস সময় সরকার প্রস্তুতির জন্য পেয়েছিলো। যেসব দেশে ব্যাপক মাত্রায় সংক্রমণ ঘটেছে তাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় কী কী ঘাটতিগুলো হচ্ছিল সেগুলো তখন ফলাও করে আসছে সংবাদমাধ্যমে। সরকার দেখেছেন, জেনেছেন, হয়তো বুঝেছেনও- কিন্তু কোন প্রস্তুতি নেননি। সত্যিকার অর্থে আমরা এখনও কোন প্রস্তুতি নিচ্ছি না। কী কী ঘাটতিগুলো হয়েছিলো এবং এখনও হচ্ছে সেটা নিয়েই আমাদের এই আলোচনা।

সরকার এন্ট্রি পয়েন্ট নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি

সরকারের পক্ষ থেকে জোর গলায় বলা হচ্ছে প্রশাসন যথেষ্ট সচেতন ছিল এবং যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হয়ছে। তাদের কথার বিশ্লেষণে যেতে হলে আমাদের কিছু তথ্যের দিকে নজর দিতে হবে। খতিয়ে দেখতে হবে যে, তথ্য কী বলছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটাকে 'পাবলিক হেলথ ইমার্জেন্সি' ঘোষণা করে ৩০ জানুয়ারি। আমাদের দেশে আমরা প্রথম আক্রান্ত ব্যক্তির সন্ধান পাই ৮ মার্চ। অর্থাৎ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ঘোষণার প্রায় মাস দেড়েকের মাথায়। এ সময় কেমন ছিল আমাদের করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা?

৭ ফেব্রুয়ারির প্রথম আলো পত্রিকার ভাষ্যমতে, '২১ জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত (৭ ফেব্রুয়ারি) চীন থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে ৭৬৯৩ জন। এদের মধ্যে ৩১২ জন বাংলাদেশি ও ২০ জন চীনা নাগরিককে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হলেও বাকিদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।'

১৬ মার্চ দৈনিক যুগান্তরের এক উপ-সম্পাদকীয়তে বলা হয়, 'পূর্ববর্তী ১ সপ্তাহে ৯৪ হাজারের বেশি যাত্রী করোনা আক্রান্ত দেশ থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। এই বিশাল সংখ্যক লোকের মধ্যে কোয়ারেন্টাইনে আছেন মাত্র ২৩৯৪ জন। এরা সবাই নিজেদের আবাসস্থলে কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন।'

সরকারি ভাষ্যমতে বিমানবন্দরে স্ক্রিনিং টিম বসানো হয়েছিল ২০ জানুয়ারি থেকেই। সন্দেহভাজনদের কোয়ারেন্টাইনের জন্য তখন থেকেই ব্যবস্থা নেয়ার কথা। সেটা দুভাবে করা যায়। একটা হলো সরকারি উদ্যোগে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন। আরেকটা হলো তাদের নিজেদের উদ্যোগে হোম কোয়ারেন্টাইন। প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন করা হচ্ছিল যেসকল জায়গায় সেসব জায়গার ব্যবস্থাপনা ছিল খুবই দুর্বল। কোয়ারেন্টাইনের নিয়মও সেখানে মানা হয়নি। দেখা গেল কোয়ারেন্টাইনে থাকা লোকেদের খাবারের জন্য, নিয়মিত *(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সাম্যবাদ

সহযোগিতা কার দরকার? কে পাচ্ছে?

২৫ তারিখ থেকে *(১ম পৃষ্ঠার পর)* সরকারি ছুটি ঘোষণা দেয়ার পর যে যত তারিখই কারখানা বন্ধ করবে সেদিন হতে লে অফ কার্যকর ধরতে হবে। শ্রম আইন অনুসারে ৪৫ দিন পর্যন্ত কারখানা লে অফ করা হলে শ্রমিকদের বেসিক বেতন ও আনুষাঙ্গিকসহ কিছু ক্ষতিপূরণ মালিককে দিতে হয়, কিন্তু স্বাভাবিক সময়ের বেতনটা তিনি পুরো পান না। আবার ৪৫ দিনের পরে আরও ১৫ দিন যদি লে অফ কার্যকর রাখতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ আরও কমে যায়। কিন্তু মালিক একটা অধিকার পান, সেটা হল, ৪৫ দিন পরবর্তী সময়ে তিনি শ্রমিককে ছাঁটাই করে দিতে পারেন। শ্রম আইনের ২০ ধারা অনুসারে এই ক্ষেত্রে তাকে ছাঁটাইয়ের সময় প্রচলিত নিয়ম অনুসরন করতে হবে না অর্থাৎ ১ মাস আগে নোটিশ দিতে হবে না। যে কোনরকম শ্রমিককে তাৎক্ষণিক ছাঁটাই করা যাবে শুধু অন্যান্য পাওনার সাথে ১৫ দিনের বেতন অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে হবে। ফলে আমরা বুঝতেই পারছি কোন রাস্তায় গার্মেন্টস মালিকরা হাঁটছেন।

২ মাস কিংবা ৩ মাস যদি কারখানা বন্ধ রাখতে হয় তবে বন্ধ কারখানার মেইনটেইনেন্স কস্ট ও শ্রমিকদের মজুরি দেয়া সম্ভব হবেনা–এরকম একেবারে সীমানা রেখা ঘেঁষে ঘেঁষে কি আমাদের মালিকরা লাভ করেন? ব্যাপারটা কি এমন যে প্রতিমাসে আয়ব্যয়ের পর কোনরকমে চলার অর্থ তাদের হাতে থাকে? ৩৫ বিলিয়ন ডলারের কাপড় প্রতি বছর রপ্তানি হয়, মাত্র ৬ বিলিয়ন ডলারের ক্রয় আদেশ বাতিল হতেই কারখানা লে-অফের ঘোষণা দাবি করছেন, অপেক্ষা না করে ছাঁটাই করে দিচ্ছেন। আবার এই ৫ হাজার কোটি টাকার বাইরে বৃহৎ শিল্পে ৯% হারে মোট ৩০ হাজার কোটি টাকা ঋণ সুবিধার ঘোষণা করা হয়েছে, যার মধ্যে ৪.৫% সরকার নিজেই ভর্তুকি দেবে। রপ্তানি পণ্য পরিবহন বাবদ ৫ হাজার কোটি টাকা এবং রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলে ১২,৭৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এর সুদের হারে ভর্তুকি দিয়ে। শুধুমাত্র এই বরাদ্দ নয়, সরকার ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক আগামী জুন মাস পর্যন্ত কোন গ্রাহককে ঋণ খেলাপী ঘোষণা করবে না, রপ্তানী আয় আদায়ের সময়সীমা দুই মাস থেকে ৬ মাস এবং আমদানী ব্যয় মেটানোর সময়সীমা ৪ থেকে বৃদ্ধি করে ৬ মাস ঘোষণা করেছে। প্রাপ্তির এই দীর্ঘ তালিকার সাথে তাদের বাদ দিয়ে গার্মেন্টস মালিকদের পদক্ষেপ কি সামঞ্জস্যপূর্ণ?

ধারণা করা হচ্ছে সারা বিশ্বে করোনা সংক্রমণ পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেবে। গোটা বিশ্বে প্রায় ২০ কোটি লোক কাজ হারাবেন। আমরা দেখেছি এই মন্দায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন শ্রমজীবীরা। বাংলাদেশেও এই পরিস্থিতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। বাংলাদেশে পোশাক খাতে কর্মরত আছেন প্রায় ৪১ লক্ষ শ্রমিক। গার্ডিয়ান পাত্রিকা বলছে, বাংলাদেশের পোশাক খাতের ১০ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হবে, কিন্তু বিজিএমই'র সভাপতি বিষয়টি অস্বীকার করে বলছেন ছাঁটাই নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই 'ক্ষতিগ্রস্তে'র নমুনা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। আসন্ন সংকট মোকাবেলায় বিভিন্ন কারখানার মালিকরা ইতিমধ্যেই শ্রমিক ছাঁটাই শুরু করে দিয়েছে। ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজ হারাবে। সরকার মুখে বলেছে কেউ কাজ হারাবে না, কিন্তু এই 'রিট্রেঞ্চমেন্ট' ও লে অফের মাধ্যমে আইনি পথেই শ্রমিক ছাঁটাই করবে মালিকরা। এ তো গেল সংগঠিত সেক্টরের শ্রমিকদের কথা, বাংলাদেশের ৬ কোটি শ্রমজীবীদের মধ্যে ৫ কোটি শ্রমিকই অসংগঠিত সেক্টরে কাজ করে। অসংগঠিত সেক্টরের শ্রমজীবীদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৭৩০ কোটি টাকা। এই বিশাল সংখ্যক মানুষের জন্য এই বরাদ্দ অত্যন্ত অপ্রতুল। আবার এই বিশাল সংখ্যক মানুষের কোন সুনির্দিষ্ট তালিকা সরকারের কাছে নেই। ফলে বরাদ্দ করা টাকাটাও তাঁরা পাবেন এরও কোন নিশ্চয়তা নেই। এ রকম পরিস্থিতিতে এই অসংগঠিত শ্রমিকরা এক চূড়ান্ত অনটনের মধ্যে পড়েছেন। বিভিন্ন জায়গায় তারা রাস্তা অবরোধ করছেন, বিক্ষোভ করছেন। এর ফলে সমাজ জুড়ে বিশৃঙ্খলা, চুরি, আত্মহত্যাসহ নানা ধরণের নেতিবাচক প্রবণতা তৈরি হবার আশংকা করছেন অপরাধ বিশেষজ্ঞরা। তাই করোনা সংক্রমণের ফলে যে প্রভাব বর্তাবে তাতে সংকটে পড়বে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ।

পুঁজিবাদী পথে বাজার সংকট মোকাবেলা করার জন্যও নিম্নআয়ের লোকেদের জন্য বরাদ্দ দরকার

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন দেশকে আসন্ন অর্থনৈতিক সংকট থেকে রক্ষা করতে এই প্রনোদনা প্যাকেজ। সত্যি কি এই বরাদ্দটি দেশের আসন্ন সংকট থেকে সাধারণ মানুষকে উদ্ধার করতে পারবে? এই বিষয়টি বিচার করতে হলে আমাদের দেশে চলমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে একটু নজর দিতে হবে। এই দেশের পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাটি দাঁড়িয়ে আছে মূলত স্বয়ংক্রিয় বাজারের উপর। আর বাজার ব্যবস্থাটি নির্ভর করে মূলত জনগণের ক্রয় ক্ষমতার উপর। জনগণের ক্রয় ক্ষমতা ও পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থার পরস্পর বিপরীতমুখী অবস্থানের কারণে অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয়। এই সমস্যাটি দূর করতে হলে এ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ভেঙে দেয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই। এখন এই ব্যবস্থা বহাল রেখে কিভাবে এই সংকট সাময়িকভাবে মোকাবেলা করা যায় এ নিয়ে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন সময়ে দাওয়াই বের করেন। তাদের সেভাবে পুরস্কৃতও করা হয়। এবার যেমন অভিজিৎ বন্দোপাধ্যায়কে অর্থনীতিতে নোবেল দেয়া হলো। তাঁর কাজের মূল বক্তব্য হলো প্রান্তিক মানুষের হাতে টাকা দিয়ে ক্রয় ক্ষমতা বাড়ানো।

এবার আমরা যদি আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে নজর ফেরাই তবে দেখবো, এ দেশের কৃষক, সংগঠিত ও অসংগঠিত সেক্টরের শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসহ শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা প্রায় ৯০ ভাগ। করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই মানুষরা। তাদের কাজ নেই তো আয় নেই, আবার হাতে সঞ্চিত অর্থও নেই। ফলে পুঁজিবাদী পথেও যদি অর্থনীতিকে রক্ষা করতে হয়, তবে এই শ্রমজীবী মানুষের হাতেই এই বিরাট বরাদ্দের প্রধান অংশ যাওয়া উচিৎ। এগুলো আমাদের কোনো বৈপ্লবিক দাবি নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা রক্ষাকারী বিশেষজ্ঞদের কথা। কিন্তু বেশুমার লুটপাটের মধ্যে সরকার সে কাজটুকু করছে না। ২% হার সুদে গার্মেন্টস মালিকদের দেয়া ঋণ শুধু শ্রমিকদের বেতন বাবদ দেয়া হবে-এই জোরালো মত দিয়ে তাদের ব্যাংক কিংবা মোবাইল একাউন্ট করতে বলা হল। অনেকে অনেক ঝামেলা করে সেটা করলেন। কিন্তু বেতন তাদের একাউন্টে গেল না। অর্থাৎ টাকাটা মালিকদের তহবিল বৃদ্ধির কাজেই গেল। সরকারও আর উচ্চবাচ্য করলেন না। আমরা যদি উপরোক্ত প্রায় ৭৩ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দের বিষয়টিতে মনোযোগ দিই, দেখবো বাজারের যারা মূল ক্রেতা; এই বিরাট শ্রমজীবী, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কৃষক- তাদের বাঁচার কোন উপায়ই এখানে রাখা হয়নি, বরাদ্দের পুরো টাকাটাই সোজাভাবে এবং ঘুরিয়ে মূলত দেশের পুঁজিপতিদের পকেটেই তুলে দেয়া হয়েছে।

ত্রাণ তৎপরতার নামে চলছে প্রহসন

সরকার মুখে যতই হম্বিতম্বি করুক না কেন, কিন্তু এই দুর্যোগে তার ত্রাণ তৎপরতা একেবারেই অপ্রতুল। ইতিমধ্যে সারা দেশের প্রায় সবকিছু বন্ধ। হাতে টাকা নেই শ্রমজীবী মানুষের, ফলে প্রচন্ড খাদ্য সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। একটি টিসিবির ন্যায্যমূল্যের গাড়ি আসবে বলে মধ্যবিত্তরা তিন-চার ঘন্টা আগে থেকে লাইন দিচ্ছেন। আর এই শ্রমিকদের হাতে টাকা নেই, তারা অপেক্ষা করেন ত্রাণের গাড়ির জন্য। এই ত্রাণের যতটুকুও বা বরাদ্দ হয়েছে তাও পৌঁছাচ্ছে না মানুষের ঘরে। ইতিমধ্যে সারাদেশে ত্রাণের চাল আত্মসাতের অভিযোগে কয়েকশত গ্রেফতার হয়েছে, যারা প্রায় সকলেই সরকার দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী। ত্রাণের চালের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ করছে সাধারণ মানুষ। কোথাও কোথাও ত্রাণের জন্য সেনাবাহিনীর গাড়ি পর্যন্ত আটকে দিচ্ছে শ্রমিকরা। সামলানো যাচ্ছে না বলে ১০ টাকা কেজির চাল বিক্রি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সরকার সাধারণ মানুষকে ঘরে থাকতে বলছে, কিন্তু খাবারের বন্দোবস্ত করছে না। শহর ও গ্রামগুলোতে জন প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ত্রাণ দেয়ার চেষ্টা করছে সরকার, কিন্তু এই জনপ্রতিনিধিদের ব্যাপারে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উঠেছে। বিভিন্ন স্থানে কাউন্সিলর-চেয়ারম্যান গ্রেফতার হয়েছেন। মৌলভীবাজারের সংসদীয় আসন-২ (কুলাউড়া)'র এমপির কাছে ত্রাণ চেয়ে টেলিফোন করলে তিনি যে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছেন তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এসেছে। অন্যদিকে ত্রাণের জন্য ডেকে নিয়ে বৃদ্ধকে রক্তাক্ত করার খবর সবাইকে হতবাক করেছে। ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে কাউন্সিলরদের মাধ্যমে যে ত্রাণ দেয়া হচ্ছে, তারা মূলত ভোটার কার্ড দেখে ত্রাণ দিচ্ছে। অথচ এ সকল শহরের বেশিরভাগ মানুষই স্থানীয় ভোটার নয়, কাজের সূত্রে শহরে থাকেন। ফলে গোটা ত্রাণ বিতরণ ব্যবস্থাটাই ত্রুটিপূর্ণ।

মুনাফা নির্ভর সমাজ ও সরকার সংকটের মূল কারণ

আমরা সামগ্রিক আলোচনায় দেখলাম করোন সংক্রমণের প্রথম থেকে আজ অবধি সরকার শ্রমিক-কৃষকসহ সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, কাজ ও খাবারের নিরাপত্তা দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। অথচ তার বিপরীতে মালিকদের স্বার্থ রক্ষায় সদা তৎপর। এর কারণ কী? বাস্তবে আমাদের সরকার হলো পুঁজিপতি শ্রেণির সরকার। তাই তার প্রধান কাজই হলো মালিকদের মুনাফা নিশ্চিত করা। পূর্বে শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি জনগণের অশেষ ত্যাগের ফলে ন্যূনতম যে গণতান্ত্রিক অধিকারের ধারণা গড়ে উঠেছিল, আজকে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে সেগুলো কর্তন করা হচ্ছে। ফ্যাসিবাদ আজকের দিনে উন্নত-উন্নয়নশীল সকল দেশের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। আমাদের দেশের দিকে তাকালেও আমরা তা স্পষ্ট দেখতে পাই। নির্বাচন নামের প্রহসনে বিনা ভোটে জেতা সরকার ক্ষমতায়। যারা তাকে ক্ষমতায় বসিয়েছে সেই একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীর জন্যই তার সমস্ত আয়োজন, সাধারণ মানুষের জন্য সরকার ভাবছে না। এ সময়ে সরকারের সকল কার্যক্রমে তা স্পষ্ট। শুধু আমাদের দেশ নয় আমেরিকা, চীন এই সকল দেশের অবস্থাও একই রকম। আমাদের দেশের সরকার যেমন করোনা পরিস্থিতি পূর্ব থেকে জানা সত্ত্বেও শুধুমাত্র পুঁজিপতিদের ক্ষতি হবে–এই বিবেচনায় করোনা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি, আমেরিকাও তা করেনি। করোনা সংক্রমণ মহামারী হতে পারে এই তথ্য তারা গত বছরের অক্টোবরে পেয়েছিল, কিন্তু কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। তখন উদ্যোগ নিলে বিশ্ব আজ এত সংকটে পড়ত না। আর চীন আক্রান্ত হওয়ার পর ট্রাম্প করোনা ভাইরাসকে 'চীনা ভাইরাস' আখ্যা দিয়ে নিজের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান শক্ত করতে চাইলেন। এদিকে চীন শুধু কোভিড ১৯ এর রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সংক্রান্ত সামগ্রী রপ্তানীর মাধ্যমে ১৪০ কোটি ডলার আয় করেছে এবং চিকিৎসা সামগ্রী দিয়ে সহযোগিতার নামে আমাদের দেশসহ বিভিন্ন দেশে তার রাজনৈতিক অবস্থান শক্ত করতে চাইছে।

কোভিড ১৯ আজ গোটা দুনিয়াকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। মানবজাতিই আজ এক সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এই সময়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করলে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মুনাফানির্ভর সমাজ ও সরকার মানুষের পাশে দাঁড়ায় না, বরং সংকটের জন্ম দেয়। কোভিড ১৯ এর বিস্তার মোকাবেলায় সরকারের ভূমিকা একথা প্রমাণ করে দিলো শ্রেণিবিভক্ত সমাজে যত বড় সংকটেরই জন্ম হোক না কেন, তার শ্রেণি উর্ধ্ব কোন সমাধান নেই। সরকার সর্বৈব মালিকদের পক্ষে কাজ করে যায়। এই হলো তার চরিত্র। তাই সংক্রমণ প্রতিরোধে যেমন সবাইকে সচেতন থাকতে হবে, একইভাবে আগত দিনে মুনাফা নির্ভর সমাজ, সরকার-রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং শ্রেণী সমন্বয়বাদী যেকোন নীতির বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির সচেতন লড়াই গড়ে তুলতে হবে।

চা-শ্রমিকদের আন্দোলন

হবিগঞ্জের রেমা চা-বাগান সচল করা, শ্রমিকদের উপর দেয়া মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও বকেয়া মজুরি পরিশোধের দাবিতে শ্রমিকদের আন্দোলনে সংহতি জানান বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল রায় ও হবিগঞ্জ জেলার আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ

পানির অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ওয়াসা ভবনের সামনে বাসদ (মার্কসবাদী) ঢাকা নগর শাখার অবস্থান কর্মসূচি

মন্দার উৎস পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে, করোনা তাকে তরান্বিত করেছে মাত্র

করোনা মহামারী পুরো বিশ্বকে জোর ধাক্কা দিয়েছে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক ভাইরাস আজ সারা দুনিয়ায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। চীনের একটা শহর থেকে শুরু হয়ে অল্প সময়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ–সারা বিশ্বের আনাচে-কানাচে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ছে, বাড়ছে মৃত্যু। পুরো বিশ্বজুড়ে চলছে লকডাউন, উৎপাদন স্তব্ধ, সীমান্ত বন্ধ, ভেঙে পড়েছে সাপ্লাই চেইন। কতদিন এ অচলাবস্থা চলবে, কারো জানা নেই। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশসহ বিশ্বের কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ। আয় নেই, ঘরে খাবার নেই। সামনের দিন কেমন কাটবে, কাজ থাকবে কিনা–সবার মনে চরম অনিশ্চয়তা। বৈশ্বিক বাজার এর মধ্যেই ৩৫% সংকুচিত হয়েছে। অক্সফাম আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, করোনা মহামারী বিশ্বজুড়ে ৫০ কোটি মানুষকে দারিদ্র্যের মুখে ঠেলে দেবে। মহামারীটি শেষ হওয়ার পর বিশ্বের ৭৮০ কোটি জনসংখ্যার অর্ধেক মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করতে পারে। বিশ্ব শ্রম সংস্থা (আইএলও) বলছে, প্রতি ৫ জন কর্মজীবীর ৪ জনই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আইএমএফ প্রধান ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা বলেছেন, ১৯৩০ সালের মহামন্দার পর বিশ্ব সবচেয়ে খারাপ অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। নানা বুর্জোয়া মিডিয়া ও অর্থনীতিবিদরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন, করোনা মহামারীর কারণে অর্থনীতিতে প্রবল মন্দা দেখা দিবে, এমনকি তা ১৯৩০ সালের পুঁজিবাদী অর্থনীতির 'মহামন্দা'কেও ছাড়িয়ে যাবে। বাস্তবিকই দুনিয়া একটা মহামন্দার মধ্যেই পতিত হতে যাচ্ছে।

আসন্ন মন্দার উৎস পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে, করোনা তাকে তরান্বিত করেছে মাত্র। কিন্তু আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, বুর্জোয়া মিডিয়া ও অর্থনীতিবিদরা দেখাতে চান, বিশ্ব অর্থনীতিতে কিছু সংকট চলছিল, তবে তা কেটে যেত, কিন্তু করোনা মহামারীর ফলেই এ অর্থনৈতিক মন্দার সৃষ্টি। দায় পুঁজিবাদের নয়, করোনা মহামারীর। তারা সচেতনভাবে যে সত্যটা আড়াল করতে চান তা হলো, পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মন্দা চলছিলই। সে মন্দা তীব্রতর রূপ ধারণ করে মহামন্দা আকারে বিস্ফোরণের অপেক্ষায় ছিল। করোনা মহামারী সে বারুদে শুধুমাত্র আগুন ছুঁইয়েছে। আজ না হোক কাল, বিস্ফোরণ তার ঘটতই।

এর সত্যতা পাওয়া যাবে করোনা মহামারী দেখা যাওয়ার পূর্বে বিভিন্ন বুর্জোয়া পত্রপত্রিকাতেই। পুঁজিপতিদের মুখপত্র দ্যা ইকোনমিস্ট-এর গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইকোনমিস্ট ইনটেলিজেন্স ইউনিট ২০২০ সালের জানুয়ারিতেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল, "আরেকটি মন্দায় ঢুকছে বিশ্ব অর্থনীতি।" ২০১৯ সালের ৯ জুলাই নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল "বিশ্বমন্দায় ঝুঁকি বাড়ছে।" বিশ্বব্যাংকের ৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হচ্ছে, "চলতি বছর সরকারি ও বেসরকারি খাতে ঋণের পরিমাণ জিডিপির তুলনায় ১৭০ শতাংশ বেশি হতে যাচ্ছে।" বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম ২০২০ সালের বৈশ্বিক ঝুঁকি রিপোর্টে বলেছিল, "২০২০ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সম্পদের স্বল্পকালীন মূল্যবৃদ্ধি বা বুদবুদ, অবকাঠামোগত ব্যর্থতা, মুদ্রা সংকোচন, জ্বালানির মূল্য নিয়ে কাঁপুনি, অর্থনৈতিক ব্যর্থতা, অর্থসংকট, অবৈধ বাণিজ্য, বেকারত্ব ও নিয়ন্ত্রণহীন মুদ্রাস্ফীতির মতো জটিল সমস্যার সম্মুখীন হবে।"

কেন ২০২০ সালে সম্ভাব্য ভয়াবহ মন্দা আসবে বলে বার বার সতর্কবাণী উচ্চারিত হচ্ছিল?

কারণ পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিগত অনেকদিন ধরেই কার্যত ভেন্টিলেশনে আছে। পুঁজিবাদী নয়া-উদারনৈতিক অর্থনীতির দাওয়াই হলো, অর্থনীতির সংকট কাটাতে হলে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ নয়, জনগণের জন্য কল্যাণমূলক প্রকল্প নয়, সবই বেসরকারি মালিকানায় ও বাজারের উপর ছেড়ে দাও। পুঁজিপতিদের উপর কর কমাও, সুদে হার কমাও, তাহলে পুঁজি বিনিয়োগ বাড়বে, কর্মসংস্থান বাড়বে।

বাস্তবে এসবকিছুরই তেমন ফলাফল নেই। কারণ পুঁজি উৎপাদনের ঝুঁকি এড়ানোর জন্য তা ছেড়ে অধিক মুনাফার জন্য ছুটল ফাটকা কারবারে। পণ্য উৎপাদন ছেড়ে পুঁজি খাটছে শেয়ার বাজার, টাকাকড়ির ব্যবসা ও রিয়েল এস্টেটে। টাকাকড়ি ও ঋণের ব্যবসায় ফাটকাবাজি ২০০৮ সালে প্রথমে আমেরিকা, এর সাথে বিশ্বব্যাপী সংকট ডেকে আনলো। ২০০৭ সালে আমেরিকায় গৃহঋণ সংকটকে কেন্দ্র করে অর্থনীতির ধস এবং পুরো বিশ্ব জুড়ে এ ধস ছড়িয়ে পড়েছিল। পুঁজিবাদী দেশগুলোর শেয়ার মার্কেট ধসে পড়ে। বিশাল বিশাল কর্পোরেট কোম্পানি, ব্যাংক-বীমা এক ধাক্কায় দেউলিয়া হয়ে যায়। এটাকে বলা হয় সাব প্রাইম সংকট। সে মন্দার ধাক্কায় সারা বিশ্বে কোটি কোটি মানুষ বেকারত্ব, ছাঁটাই, অনাহার, দারিদ্র্যের অন্ধকারে পতিত হয়েছিল। কিন্তু দেশে দেশে পুঁজিপতি সরকারগুলো এ মন্দা থেকে সাধারণ মানুষকে উদ্ধার ও সহায়তা করার পরিবর্তে পুঁজিপতিদের সংকট থেকে উদ্ধারের জন্যই নানা বেইল-আউট কর্মসূচি বা নানা আর্থিক প্রণোদনা নিয়ে এগিয়ে আসে। দেউলিয়া হয়ে যাওয়া পুঁজিপতিদের উদ্ধারের জন্য তাদের দায়দেনা রাষ্ট্র তার কাঁধে তুলে নেয়। ঘাটতি মেটাতে রাষ্ট্রগুলো হাত দেয় জনগণের জন্য ব্যয় করা সামাজিক সুরক্ষা তহবিলে। দেশে দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ নানা সামাজিক খাতে বরাদ্দ আবার নির্মমভাবে কাটছাঁট করা হয়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো নয়া-উদারনৈতিক অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণের ফলে বেসরকারিকরণ আরও তীব্রতর হয়। এর মাধ্যমে কর্পোরেট সংস্থাগুলো চনমনে আর পুঁজিবাদী অর্থনীতি কৃত্রিমভাবে তেজী হয়ে উঠলেও তা সাময়িক। কারণ কর্পোরেট সংস্থাকে খাদ থেকে টেনে তুলতে গিয়ে শ্রমজীবী জনগণের উপর নামিয়ে আনা হয়েছে ছাঁটাই, মজুরি হ্রাস, মূল্যবৃদ্ধি, পেনশন, সামাজিক ব্যয়ের উপর খড়্গ। যার অশ্যম্ভাবী ফল জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস। অর্থাৎ বাজারে পণ্য আছে, কিন্তু জনগণের কেনার ক্ষমতা নেই। কেনার ক্ষমতা নেই, তাই বাজারে চাহিদা নেই। ফলে তীব্র বাজার সংকট। এই হচ্ছে পুঁজিবাদের দুষ্ট চক্র, এ থেকে তার নিস্তার নেই। ফলে ২০০৮-এ সৃষ্ট মন্দা থেকে বাঁচার জন্য পুঁজিবাদ আরও তীব্র মন্দাকেই ঘনীভূত করেছে, এ থেকে বেরোনোর পথ পাচ্ছে না বিশ্ব পুঁজিবাদ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো অর্থনীতির সামরিকীকরণের দিকে যায়। বাজার সংকটের কারণে যেহেতু বাজারে ক্রেতা নেই তখন রাষ্ট্রকে বাজার সৃষ্টি করতে হয়। বড় বড় পুঁজিপতিরা অস্ত্র উৎপাদন করে, রাষ্ট্র সেই অস্ত্র কিনে। তখন অস্ত্রের বাজার চাঙ্গা হয়। অস্ত্র উৎপাদনের সাথে যুক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও কিছু সহযোগী ব্যবসা তখন সৃষ্টি হয়। বাজারে তখন গতি আসে। কিন্তু সমস্যা হল রাষ্ট্র অস্ত্র কিনে তো আর ফেলে রাখতে পারে না। আরও অস্ত্র কিনতে হলে মজুত অস্ত্র খালাস করা দরকার। তাই সে যুদ্ধ বাঁধায়, যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব সৃষ্টি করে। তখন অস্ত্র খালাস হয়। বিশ্বযুদ্ধ যদি নাও বাঁধাতে পারে আংশিক ও স্থানীয় যুদ্ধ বাঁধায়। কারণ এ ছাড়া তার বাঁচবার কোন পথ নেই। কিন্তু তারপরেও কোনভাবেই সে শেষরক্ষা করতে পারছেনা। পুঁজিবাদী অর্থনীতি স্থায়িত্ব পাচ্ছে না।

তথাকথিত উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতির অবস্থা কী

পুঁজিবাদী অর্থনীতির ইঞ্জিন খ্যাত আমেরিকার অর্থনীতির শোচনীয় অবস্থাতেই তা বোঝা যায়। এখন মার্কিন দেশে আড়াই কোটি লোক বেকার। পুঁজিপতিদের সম্পদের পাহাড় স্ফীত হচ্ছে। গত এক দশকে যুক্তরাষ্ট্রের ধনীর সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। ২০০৮ সালে বিলিয়নিয়ারের সংখ্যা ছিল ২৬৭ জন, ২০১৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০৭ জনে। জেফ বেজোস, বিল গেটস, ওয়ারেন বাফেটসহ দেশটির শীর্ষ পাঁচ ধনী এখন দেশটির মোট সম্পদের ৮৮ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলে বাড়ছে ধনবৈষম্য। গরীব মানুষের জন্য তাদের আয় অনুযায়ী খাবার সরবরাহের 'ফুড স্টাম্প' প্রকল্পে হাত পাতা মানুষের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ৯০ লাখে, যা ২০০৮ সালের তুলনায় ৪০ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে যাদের ঘরবাড়ি নেই, আশ্রয়কেন্দ্রে রাত কাটায়–এরকম উদ্বাস্তু মানুষের সংখ্যা এক দশক আগের তুলনায় বেড়েছে ৭০ শতাংশ। বৃহৎ পুঁজিপতিরা সীমাহীন লাভের জন্য সমস্ত কাজের আউটসোর্সিং করছে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সস্তা শ্রমকে শোষণ করে বাড়তি লাভের আশায় প্রায় সমস্ত কাজ দেশের বাইরে চালান করছে। এর ফলে আমেরিকার অভ্যন্তরে উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ একেবারে তলানিতে। কাজ হচ্ছে মূলত সেবাখাতে, স্থায়ী কাজ প্রায় নেই। তার পরিবর্তে জায়গা নিচ্ছে চুক্তিভিত্তিক ও খণ্ডকালীন কাজ। সেবাখাতও সংকুচিত হচ্ছে। ২০১৯ সালে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া প্যাসিফিক এয়ারলাইন্স, এনকম্পাস এভিয়েশন ভায়া এয়ারের মতো কোম্পানিগুলো। ২০১৮ সালে বন্ধ হয়েছে ১১টি এয়ারলাইন্স। ২০১৯ সালে বিলুপ্ত বা অঙ্গীভূত হয়েছে ৪টি ব্যাংক, দেউলিয়া হয়ে বন্ধ হয়েছে বিভিন্ন খাতের ২৯টি বড় কোম্পানি। ফলে দেশে যেমন সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে না, অন্যদিকে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমছে। কমছে কর বাবদ সরকারের আয়। পুঁজিপতিদের কর্পোরেট ট্যাক্স কমানো হয়েছে। অপর দিকে বাড়ছে পুঁজিপতিদের দেয়া প্রণোদনা বা স্টিমুলাস বাজেট এবং সারা দুনিয়ায় মার্কিন যুদ্ধযন্ত্রকে সচল রাখার বিপুল খরচ। ফলে বাড়ছে বাজেট ঘাটতি। ঋণের ভারে আমেরিকা হাঁসফাঁস করছে। মার্কিন সরকারের মোট বাহ্যিক ঋণ দাঁড়িয়েছে সে দেশের জিডিপির ১০৮ শতাংশের বেশি।

ইউরোপের ইঞ্জিন খ্যাত জার্মানীও মন্দায় বিপর্যস্ত। দেশটির গাড়ি শিল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে। ২০১৯ সাল দেশটিতে গাড়ি উৎপাদন কমেছে প্রায় ১০ শতাংশ। গত নভেম্বরে জার্মান বিশ্বখ্যাত গাড়ি কোম্পানি অডি ৭ হাজার ৫০০ কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দিয়েছে। (দৈনিক প্রথম আলো, ২৮ নভেম্বর ২০১৯)। জার্মান রাষ্ট্রের ঋণও ক্রমাগত বাড়ছে।

জাপানের বাহ্যিক ঋণ তাদের জাতীয় আয়ের ২০০ শতাংশ অতিক্রম করেছে। জাপানের জিডিপি ২০১৭ সালে ছিল ১.৯ শতাংশ, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে তা কমে দশমিক আটে নেমে আসে। বিগত ১০ বছরে জাপানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদন থমকে আছে। ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে জাপানের নিপ্পন কম পোর্টালে অর্থনৈতিক বিশ্লেষক ও গবেষক কুউওয়াবারা মিনোজর লেখা একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তাঁর গবেষণায় দেখা যায়, জাপানে সে সময় বিভিন্ন ব্যাংক তাদের শাখার সংখ্যা ২০ শতাংশ এবং কর্মী সংখ্যা ৪০ শতাংশ হ্রাস করেছে। এছাড়া অভিজ্ঞদের বাদ দিয়ে কম বেতনে সাধারণ কর্মী নিয়োগের সংখ্যা বাড়ছে দ্রুততার সাথে। জাপানে তিনটি বড় কোম্পানি মিজোহা ফিনানশিয়াল গ্রুপ ১৯ হাজার, মিতসুবিশি ইউএফজে ফিনানশিয়াল গ্রুপ সাড়ে ৯ হাজার এবং সুমিতোমো মিটসুই ফিনানশিয়াল গ্রুপ ৪ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বৃটেনের রাষ্ট্রীয় বাহ্যিক ঋণ জিডিপির প্রায় ৮৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০১৯ সালে বৃটেনের ৮টি বড় বা জায়ান্ট কোম্পানি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়াতে প্রশাসক নিয়োগ করে। (এনএস বিজনেস, ৪ নভেম্বর ২০১৯)। বৃটেনের অর্থনীতির লেজেগোবরে অবস্থা বোঝা যাবে থমাস কুকের মতো শতবর্ষী বৃহৎ কোম্পানির দেউলিয়া হওয়ার প্রতীকী ঘটনায়। বিবিসি রিপোর্ট (২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯) করছে, ১৭৮ বছরের প্রাচীন বৃটেনের পর্যটন ও বিমান সংস্থা অব্যাহত লোকসান ও ঋণের ভারে নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করেছে। এর ফলে শুধু বৃটেনেই ৯,০০০ কর্মী ও বিশ্বব্যাপী সংস্থাটির ২২,০০০ কর্মী চাকরি হারাবে। হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সংস্থাটির মাধ্যমে ভ্রমণে যাওয়া প্রায় দেড় লক্ষ পর্যটক সারা বিশ্বে আটকা পড়ে। বৃটিশ সরকার ৫৬টা বিমানে বিভিন্ন দেশ থেকে তাদের ফেরত আনে। বৃটিশ রিটেইল কনসোর্টিয়াম বলছে, ২০১৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত শুধু খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রভিত্তিক লক্ষাধিক কর্মী চাকরিচ্যুত হয়েছেন। অদূর ভবিষ্যতে এ ধরনের আরও ৯ লক্ষ কর্মী চাকরি হারাতে পারেন বলে সংস্থাটি আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে।

মন্দায় হাবুডুবু খাওয়া ফ্রান্স তীরে উঠতে এবং দেশের বৃহৎ পুঁজিপদিদের স্বার্থে ২০২২ সালের মধ্যে ১ লক্ষ ২০ হাজার শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা নিয়েছে। শ্রম আইন সংশোধন করে স্থায়ী চাকরির বদলে স্বল্পমেয়াদী চুক্তিভিত্তিক নতুন শ্রমিক নিয়োগ, অবসরের বয়স কমানো ও অবসরভাতা ও অন্যান্য প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা কমানোর পরিকল্পনা করেছে। রেলসহ রাষ্ট্রায়ত্ত নানা খাত বেসরকারিকরণ, শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ সামাজিক নানা খাতে ব্যয় হ্রাসের পথে ফ্রান্স জোরেশোরে হাঁটছে। যার প্রতিবাদে ২০১৯ সাল জুড়ে ফ্রান্সে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী-ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণে একের পর এক গণআন্দোলনের ঢেউ উঠেছে।

ইতালির অর্থনৈতিক সংকট এত তীব্র আকার ধারণ করেছে যে, ২০১৯ সালের নভেম্বরে রাষ্ট্রটির বাহ্যিক ঋণ দাঁড়িয়েছে জিডিপির প্রায় ১৩৫ শতাংশ।

চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিগত ৩০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্নে অবস্থান করছে। চীনও ক্রমাগত ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ভারতের মতো পুঁজিবাদী দেশগুলোও মন্দায় থরথর করে কাঁপছে গত কয়েকবছর। বিশ্বের প্রথম সারির ব্যাংক হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন বা এইচএসবিসি ২০১৯ সালে তাদের লাভ এক তৃতীয়াংশ কমে যাওয়ায় বিশ্বব্যাপী তাদের বিভিন্ন শাখায় ৩৫ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দিয়েছে। (বিবিসি–১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০) বিশ্বব্যাপী চলছে বাজার সংকট। বাজারের ভাগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, বাণিজ্যযুদ্ধ তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

উপরের আলোচনাতেই স্পষ্ট, পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিগত অনেক বছর ধরেই ১৯৩০ সালের মহামন্দার মতো আরেকটি মহামন্দার দিকেই ছুটছে। করোনা মহামারীর কারণে তা তরান্বিত ও এগিয়ে এসেছে মাত্র।

প্রয়োজন পরিকল্পনা, অনুদান

(১ম পৃষ্ঠার পর) সংখ্যা অন্য সকল সেক্টরে মোট কর্মরতদের সংখ্যার চেয়েও বেশি। আবার এই সময়ে, এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত রাখার জন্য কৃষি, কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের রক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই।

তাই এই সময়ে সরকারের দায়িত্ব ছিল একটি বড় অংকের অনুদানের ব্যবস্থা করা। কিন্তু সরকার এই সময়ে ৪% সুদে যে ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা শুধু কৃষকের সাথে প্রতারণাই নয়, দেশের খাদ্য নিরাপত্তাকেও হুমকির মুখে ফেলা। এছাড়া গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, কৃষকদের ভর্তুকি হিসেবে সারের জন্য ৯ হাজার কোটি টাকা, কৃষি যন্ত্রীকরণের জন্য ১০০ কোটি টাকা, বীজের জন্য ১৫০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাতে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু এ বরাদ্দ নতুনভাবে দেওয়া হবে নাকি আগের বরাদ্দের সাথে সমন্বয় করা হবে–সে সম্পর্কে কোনো বক্তব্য দেওয়া হয়নি। আগের বণ্টন ব্যবস্থা থেকে দেখা যায়, এই ভর্তুকি থেকে ব্যবসায়ীরাই লাভবান হয়েছে। এক্ষেত্রে বণ্টন ব্যবস্থা নতুনভাবে সাজানো না হলে এ ভর্তুকি সুবিধা কৃষক পাবে না।

কৃষিঋণ কৃষকের উপকারে আসবে না

এই ঋণের টাকা কতদিনের মধ্যে ফেরত দিতে হবে? ১৩ এপ্রিল বাংলাদেশ ব্যাংক একটা সার্কুলার জারি করেছে। তাতে বলা হচ্ছে, "১৮ মাসের মধ্যে ঋণ ফেরত দিতে হবে। এর প্রথম ছয় মাস গ্রেস পিরিয়ড থাকবে, মানে এ সময় কিস্তি দেওয়া লাগবে না। বাকি ১২ মাসে বারো কিস্তির মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।"

রপ্তানীভিত্তিক শিল্পের মালিকদের ২ শতাংশ সুদে যে ৫ হাজার ঋণ দেয়া হল তার শর্ত ছিল, ছয়মাস পর থেকে ঋণের টাকা পরিশোধ করা শুরু করতে হবে। কোন নির্দিষ্ট সময় তাদের বেঁধে দেয়া হয়নি।

এই ঋণ কারা পাবেন? গত ১৭ এপ্রিল প্রথম আলো পত্রিকায় মো.আরিফুজ্জামান এই ঋণ নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। আমরা তাঁর লেখা থেকে সরাসরি উদ্ধৃত করছি, " কৃষক ঋণ পাবেন 'কৃষিঋণ নীতিমালা' অনুযায়ী। এ নীতিমালা অনুযায়ী ৫ একর বা ১৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিক সর্বোচ্চ আড়াই লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবেন। সে জন্য তাঁদের জমির দলিল বন্ধক রাখতে হবে। যাঁদের জমি নেই, তাঁরাও এই ঋণ পাবেন, তবে সে ক্ষেত্রে কৃষককে যাঁর জমি ভাড়া নিয়ে চাষ করেন, সেই ভাড়ার চুক্তিপত্র জমা দিতে হবে। বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশে প্রান্তিক খেটে খাওয়া ভূমিহীন চাষি কখনোই চুক্তি করে জমি লিজ নেন না। আর অকৃষক জমির মালিক লিখিত চুক্তির মাধ্যমে কোনো চাষিকে জমি বর্গা দেন না। এ জন্য বর্গা চাষির দোষ নেই, কারণ লিখিত চুক্তির মাধ্যমে জমি বর্গা দিলে সরকারকে ফি দিতে হয়। সেই ফি জমির মালিককেই পরিশোধ করতে হয়। ফলে, এই পাঁচ হাজার কোটি টাকার ঋণ প্যাকেজ থেকে বর্গা চাষির ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। শুধু তা-ই নয়, কৃষকদের সবচেয়ে বড় অংশ ধান চাষ করেন, কোনো একটা এলাকায় যদি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বড় অংশ ব্যাংক পর্যন্ত যান ঋণের জন্য, তাহলে ওই অঞ্চলে বরাদ্দকৃত ঋণের ৩০ শতাংশই কেবল ধানচাষিরা পাবেন।

বাংলাদেশে জেলাভেদে ফসলের উৎপাদনও ভিন্ন হয়। ফলে, সারা বাংলাদেশের কৃষকের জন্য গড় এই বেঁধে দেওয়া শতাংশ হার কৃষকের জন্য কতটা সুফল বয়ে আনবে, সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এই সার্কুলারে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, তা হলো যেসব উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান কৃষক কর্তৃক উৎপাদিত কৃষিপণ্য কিনে সরাসরি বিক্রি করে থাকে, তারা এই ঋণ প্যাকেজের আওতায় আসবে। এসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ পাঁচ কোটি টাকা ঋণ পাবে।

অর্থাৎ যে কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল উৎপাদন করেন, তিনি পাবেন সর্বোচ্চ আড়াই লাখ টাকা। আর যিনি কৃষকের ফসল কম টাকায় কিনে বেশি টাকায় বিক্রি করবেন, সেই মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়ারা ঋণ পাবেন পাঁচ কোটি টাকা। অথচ বহুকাল ধরে দাবি জানানো হচ্ছে, কৃষকের উৎপাদিত ফসল কীভাবে সরাসরি ক্রেতার কাছে যেতে পারে, সে রকম একটা ব্যবস্থা সরকারিভাবে গড়ে তোলা হোক। উল্টো এই ঋণব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীদের অবস্থান পোক্ত করা হয়েছে।

চলতি বোরো মৌসুমে ২ কোটি টন ধান উৎপাদন হতে পারে। কিন্তু সরকার কিনবে মাত্র ১৯ লাখ টন। বাকি ধান কৃষকের কাছ থেকে কম দামে কেনেন এই ফড়িয়া মধ্যস্বত্বভোগীরা। কৃষকের নামে দেওয়া ব্যাংকঋণ নিয়ে কেনার সুবিধা কি রাখা হলো না, সে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।"

মৌসুমী সব্জী কৃষকের ক্ষেতে ও ঘরে পঁচে নষ্ট হচ্ছে

এবছর রবি মৌসুমের ফসল হিসেবে আলুর ফলন ভাল হয়েছে। মিষ্টি কুমড়া, টমেটো, করলা, বেগুন, লাউ, শিমসহ অন্যান্য সব্জীর আবাদও ভালো হয়েছে। ভালো ফলন হয়েছে বিভিন্ন রঙিন শাকেরও। কিন্তু লকডাউনের কারণে কৃষক তা বিক্রি করতে পারছেন না। পাইকারি বাজারে দাম পাচ্ছেন না, খুচরা বাজারে নিজে নিয়ে বসবেন সে উপায়ও নেই। বাজারে ক্রেতা নেই। বসতে দেখলেই পুলিশ তেড়ে আসছে। কৃষক বেগুন বিক্রি করছে কেজি প্রতি ২ টাকা, মরিচ কেজি প্রতি ৩ টাকা, টমেটো কেজি প্রতি ২ টাকা। ফসল থেকে লাভবান হওয়া তো দূরের কথা, পরিবহন খরচটুকুই সে তুলতে পারছে না। প্রচুর পরিমাণে মৌসুমী শাকসব্জী জমিতেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দুগ্ধ খামারীরা ক্রেতার অভাবে দুধ ফেলে দিচ্ছে, প্রতিদিন ৬৮ কোটি টাকার দুধ নষ্ট হচ্ছে, অথচ খাবারের জন্য হাহাকার করছে মানুষ। পোল্ট্রি আর মৎস্যখামারীরা যথাযথ মূল্য পাচ্ছে না। অথচ কাঁচা বাজারে তা বিক্রি হচ্ছে উচ্চমূল্যে। এই অবস্থায় কৃষক যখন এ মৌসুমে তার ফসলের উৎপাদন খরচই তুলতে পারছে না, তখন এত শর্তের পরও যদি কেউ ঋণ পায় তাতো সে তার নিজের জীবন ধারণের জন্যই ব্যয় করবে। নতুন ফসল উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে না। ফলে নতুনভাবে ঋণের জালে জড়িয়ে আরও বিপদে পড়বে। উৎপাদনও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

মানুষ অভাবে আছে, না খেয়ে দিন পার করছে। অথচ সরকারি গুদামে ধান-চাল মজুতের পরিমাণ এই সময়েই সবচেয়ে বেশি। কৃষকের ঘরে আলু ও জমিতে পর্যাপ্ত শাক-সব্জী আছে। কিন্তু সেগুলো কিনে নিয়ে গরীব মানুষের কাছে পৌঁছানোর কোনো ব্যবস্থা বা উদ্যোগ সরকারের নেই।

অথচ এ সময়ে ভালো রবি শস্যের ভালো ফলনের সুফল দেশের প্রতিটি মানুষ পেতে পারে, যদি পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ, সঠিক পরিকল্পনা ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সরকার কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থাকে নতুন করে সাজাতে পারে। এজন্য সরকারি উদ্যোগে গ্রামে গ্রামে ক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করে প্রতিটি কৃষকের কাছ থেকে ন্যায্যমূল্যে বর্তমানের আলু ও সব্জী ক্রয় করতে হবে এবং মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছানোর উদ্যোগ নিতে হব। এতে কৃষক যেমন তার ন্যায্যমূল্য পাবে, তেমনি অর্থনীতি ও মানুষ উভয়েই বাঁচবে। এটাই হবে কৃষকের জন্য প্রকৃত সাহায্য।

বোরো ধান সংগ্রহে সমন্বিত পরিকল্পনা না থাকলে সংকট অবশ্যম্ভাবী

বছরের এই সময়ের প্রধান ফসল বোরো ধান কাটা হয়ে থাকে। এই বোরো ধান প্রধানত চাষ করা হয় হাওর অঞ্চলে। তাই খুব অল্প সময়ের মধ্যে বোরো ধান সংগ্রহ করা না হলে কালবৈশাখী ঝড়, আকস্মিক বন্যায় ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। ইতোমধ্যে আবহাওয়া অধিদপ্তর এ মাসের শেষের দিকে ঘন বর্ষণ ও তার কারণে পাহাড়ি ঢল নামার পূর্বাভাস দিয়েছে। এটা ঘটলে হাওরের ফসলের বিরাট ক্ষতি হবে। ফসল দ্রুত কাটার জন্য শ্রমিক দরকার। এ সময়ে সাধারণত দেশের উত্তর অঞ্চল থেকে প্রচুর শ্রমিক ধান কাটা, মাড়াই, শুকানো প্রভৃতি কাজের জন্য এই সব অঞ্চলে এসে থাকে। এছাড়া ধান কাটা, মাড়াই, শুকানোর জন্য ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন যন্ত্র যেমন রিপার মেশিন, কম্বাইন হার্ভেস্টার, মাড়াই যন্ত্র, পাওয়ার থ্রেশার, প্যাডেল থ্রেশার প্রভৃতি।

গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, শ্রমিকের এবং যন্ত্রের অভাবে ধান তুলতে না পেরে কৃষক ক্ষেতের পাকা ধান আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে। এই করোনা প্রাদুর্ভাবের সময় লকডাউনের কারণে উত্তরাঞ্চলের শ্রমিকদের পরিবহনের অভাবে আসাটা কঠিন হবে। অন্যদিকে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে শ্রমিকদের নিয়ে আসা না হলে ভাইরাস সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার যদিও ধান কাটার শ্রমিকদের নির্বিঘ্ন চলাচলের আদেশ দিয়েছে, কিন্তু সেই সাথে যোগাযোগ, স্বাস্থ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে শ্রমিকদের পরিবহন, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং সংক্রমণ রোধের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেই সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ ধান সংগ্রহের যন্ত্র সরবরাহও নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

এ বছর বোরো ধানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০৭ লাখ মেট্রিক টন। সরকার ধান ও চাল মিলিয়ে মাত্র ১৯ লাখ মেট্রিক টন বোরো ধান সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা মোট বোরো উৎপাদনের মাত্র ১৮ ভাগ। বাকিটা ফড়িয়ারা সংগ্রহ করে। কৃষকদের সেখানে বিরাট লোকসান হয়। গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, চালের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণ হলেও কৃষক ধান বিক্রি করেছে মণপ্রতি গড়ে ২০০ টাকা করে। এ বছরও এ অবস্থা চললে কৃষক অর্থের অভাবে ধান উৎপাদনে উৎসাহ এবং পুঁজি দুটোই হারাবে। তাই এ সময়ে সরকারের সমস্ত খাদ্য গুদাম খালি করতে হবে। প্রতিটি ইউনিয়নে সরকারি ক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করে কৃষককে ধানের মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করে ধান ক্রয় করলে, এই মৌসুমেই আবার সরকারি গুদাম ভর্তি হবে, কৃষক পাবে বিপদের সময়ে অগ্রিম ন্যায্য মূল্য। এটাই হবে তার জন্যে সবচেয়ে বড় সহযোগিতা।

খরিপ মৌসুমের জন্য প্রস্তুত হতে হবে এখনই

রবি মৌসুমের ফসল তুলে কৃষক প্রস্তুত হবে খরিপ-১ এর ফসল ধান, পাট প্রভৃতি বপনের জন্য। তাই এ সময়ে কৃষকের হাতে বীজ, সার, সেচ সুবিধা প্রভৃতি পৌঁছানো প্রয়োজন। সরকার ইউরিয়া সারের জন্য ভর্তুকি দিয়ে থাকে। কিন্তু অন্যান্য সারের জন্যেও এ সময় ভর্তুকি প্রয়োজন। সরকারি উদ্যোগে কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা প্রয়োজন। আমাদের দেশের কৃষিজমির প্রায় ৯০ ভাগের সেচ হয় বেসরকারি উদ্যোগে। এত কৃষকের খরচ বাড়ে। সেচের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ২০ ভাগ ছাড়ের সুবিধা ভোগ করে থাকে পাম্পের মালিক ধনী কৃষকেরা। কিন্তু ক্ষুদ্র চাষীরা প্রধানত ডিজেলের মাধ্যমে সেচ দেয়, তারা কিন্তু এ সুবিধা পায় না। তাই তাদের জন্যে বিশেষ অনুদানের প্রয়োজন রয়েছে। সরকারি উদ্যোগে সেচের আওতা বাড়ানো দরকার।

এর পরের খরিপ-২ মৌসুমের ফসল রোপা আমন, শাকসবজি প্রভৃতি চাষের জন্য প্রস্তুতির কাজটিও শুরু করা দরকার। আমাদের সবজির বীজ আমদানি করা হয় জাপান, কোরিয়া, চীন থেকে। লকডাউন বা অন্যান্য কারণে এ আমদানি যেন ব্যাহত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পচনশীল খাদ্যদ্রব্য যেমন দুধ, ডিম, মাছ, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণের পরিমাণ বাড়ানোর ব্যবস্থাসহ বাজারে সরবারহ ও খামারীর ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে।

আশু খাদ্যসংকট মোকাবেলায় অনুদান প্রদানের বিকল্প নেই

তাই মুনাফা নয়, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে এই সময়ে সঠিক পরিকল্পনা করতে হবে। ইউনিয়ন এমনকি গ্রাম পর্যায়ে (কারণ এই মুহূর্তে পণ্য পরিবহন খুবই কঠিন ও ব্যয়সাপেক্ষ) সরকারের পক্ষ থেকে ক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করে প্রতিটি কৃষকের কাছ থেকে ন্যায্যমূল্যে বর্তমানের আলু ও সবজি ক্রয় করতে হবে, অগ্রিম মূল্যে ভুট্টা ও ধান ক্রয় করতে হবে। এর সবকিছু গুদামজাত করারও দরকার নেই। কারণ এরমধ্যে প্রতিটি গ্রামের অভাবী পরিবারের তালিকা তৈরি করে তাদের রেশন কার্ড প্রদান করার কাজটা সম্পন্ন করলে, সরকারি ক্রয়কেন্দ্রের সংগৃহীত সেই সকল আলু ও সবজি চালের সাথে রেশন হিসেবে বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। বাকিটা শহর ও অন্য জেলার বাজারে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সেজন্য কোথায় কতটুকু প্রয়োজন, কোথায় কতটুকু সংগ্রহ হবে তার পুরো হিসাবটা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাতে থাকতে হবে। এভাবে পুরো ক্রয়, বিক্রয় ও সরবরাহ চেইনটা নতুন করে ভাবতে হবে। যেহেতু এই মুহূর্তে আমাদের কোনো বিদেশি শত্রুর সাথে লড়াই করার ব্যাপার নেই, তাই এই এক্ষেত্রে সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীকে কাজে লাগানো যেতে পাতে। আর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য কৃষি খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ অনুদান হিসেবে দিয়ে কৃষকের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

ভারত ও পাকিস্তান সরকার কৃষকদের হাতে নগদ টাকা পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। সে লক্ষ্যে তারা বরাদ্দও রেখেছে। আমাদের দেশে দশটাকার একাউন্ট আছে এরকম কৃষকের সংখ্যা ১ কোটির উপরে। তাছাড়া বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থার কাছে ঋণগ্রস্ত, দরিদ্র কৃষকদের তালিকা আছে। ফলে একটা তালিকা তৈরি করে কৃষকদের আর্থিক সহযোগিতা করা অসম্ভব কিছু নয়। এর সাথে ব্যাংক কিংবা ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থার কাছে কৃষকদের যে ঋণ আছে, ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত সে ঋণ মওকুফ করতে হবে। এভাবে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কঠিন কোনো সমস্যা নয়। কিন্তু তার জন্য দরকার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত পরিমাণে আর্থিক বরাদ্দ।

দেড় মাস সময় পেয়েও অপ্রস্তুত, দিশাহারা

(১ম পৃষ্ঠার পর) স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য গায়ে লেগে লেগে লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে বরং স্বাস্থ্যঝুঁকি আরও বেড়ে গেল। সোশ্যাল ডিসটেন্সের শর্তই আর প্রয়োগ হল না। কোয়ারেন্টাইনের নিয়ম নিয়ে কথা না বাড়ানোই ভাল। এদের আলাদা আলাদা ঘরে, আলাদা আলাদা ব্যবস্থাপনায় রাখা দরকার ছিল। আবার সেখানকার খাবার ও থাকার ব্যবস্থা ছিল নিম্নমানের। ফলে শুরু হল বিক্ষোভ। এ হলো প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের অবস্থা। হোম কোয়ারেন্টাইনের অবস্থা নিয়ে পত্রিকায় বিশদভাবে এসেছে। এই লোকগুলোকে একটা নির্দেশ দিয়ে নিজেদের বিবেচনার উপর ছেড়ে দিয়ে সরকার নিশ্চিন্তে বসেছিলেন। স্থানীয় প্রশাসন ও স্বাস্থ্যবিভাগকে অবগত করেননি। কোনক্ষেত্রে করলেও স্বাস্থ্যবিভাগ খোঁজ রাখেননি। গুরুত্বও দেননি। ফলে এই লোকেরা ঘরে থাকেননি। ঘুরে বেরিয়েছেন, বিয়ে-বনভোজনে গেছেন। ফলে আমাদের চোখের সামনে active case গুলো দেশে ঢুকলো, এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লো।

ছোট আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। বিমানবন্দরে স্ক্রিনিংয়ের একটা প্রাথমিক হাতিয়ার হচ্ছে থার্মাল স্ক্যানার। ঢাকা বিমানবন্ধরের ৩টি থার্মাল স্ক্যানারের মধ্যে ২টি শুরুর দেড় মাস পর্যন্ত নষ্ট ছিল, সেসময় চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমানবন্ধরে কোন সক্রিয় থার্মাল স্ক্যানার ছিল না। এটি হলো তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অবস্থা। জ্বরবিহীন কিংবা উপসর্গবিহীনভাবে এ রোগের রোগী থাকতে পারে বেশকিছুদিন, তাদের তো স্ক্রিনিংয়ের কোন উপায়ই নেই। কিন্তু জ্বর নিয়ে আসা রোগীদের আলাদা করারও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা সরকারের ছিলনা। বেনাপোল ছাড়া দেশের সব কটি স্থল বন্দর দিয়ে দেশি-বিদেশিরা অবাধে ঢুকেছে, কিন্তু থার্মাল স্ক্যানিং পর্যন্ত হয়নি। মোটের উপর পয়েন্ট অব এন্ট্রি ছিল রক্ষীবিহীন, অবাধ।

দ্বিতীয় ধাপের করণীয় কাজও সঠিকভাবে হয়নি

পয়েন্ট অব এন্ট্রি নিয়ন্ত্রণে সীমাহীন গাফিলতির পরিচয় দেয়ায় বাংলাদেশের মতো একটি জনবহুল, ঘনবসতিপূর্ণ দেশে দ্রুত ভাইরাস ছড়িয়ে যায়। দ্বিতীয় ধাপের কাজ ছিল 'লক ডাউন' করে 'কন্টাক্ট ট্রেসিং'-এর মাধ্যমে ব্যাপকভাবে নমুনা পরীক্ষা করা আর 'প্রক্সি-ইনডিকেটর'গুলো খুব গভীরভাবে পর্যববেক্ষণ করা ও ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা চিহ্নিত করা। অর্থাৎ হাসপাতালগুলোতে শ্বাসকষ্ট ও নিউমোনিয়া নিয়ে কী পরিমাণ রোগী আসছে, কোথায় বেশি আসছে, কোন এলাকায় ফ্লু উপসর্গগুলো বেশি দেখা যাচ্ছে ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট করা ও ব্যবস্থা নেয়া।

কিন্তু সেসব কিছুই করা হল না। 'লক ডাউন' না করে ছুটি ঘোষণা করা হল। লক ডাউনে গরীব ও নিম্ন আয়ের লোকেদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম আয়োজনগুলো নিশ্চিত না করে হঠাৎ-ই ছুটি ঘোষণা করা হল। ছুটি ঘোষণা ও কার্যকর হওয়ার মাঝখানে দুদিনের সময় দেয়া হল। এই সময়ে লাখ লাখ লোক ছুটলো গ্রামের উদ্দেশ্যে। বাস ও ট্রেন স্টেশন, লঞ্চ টার্মিনাল, ফেরিঘাট সব গিজগিজ করতে লাগলো মানুষে। এটা আরেকটা বড় আকারের এবং বড় বিস্তৃতির আন্তঃজেলা সংক্রমণ ক্ষেত্র সৃষ্টি করলো।

লক ডাউনের পর 'কন্টাক্ট ট্রেসিং' করে একটা বিরাট মাত্রার টেস্ট করা হল না। একমাত্র যাদের উপসর্গগুলো খুবই স্পষ্ট এবং বিদেশ থেকে আসা বা বিদেশ থেকে আসা লোকের সংস্পর্শে আসার তথ্য আছে কেবল তাদেরই টেস্ট করা হল। কিছু থানা ও জেলায় একইসাথে বেশকিছু কেস পাওয়া যাওয়ার পর ওইসকল এলাকা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা হলো, কিন্তু টেস্ট করা হলো না। ফলে ক্লাস্টার কিংবা হটস্পট এসব ঘোষণা- বাস্তবে একটা কথার কথা হয়েই থাকলো।

এদিকে বিভিন্নভাবে যতটুকু proxy indicator গুলোর কথা জানা গেছে তাতে সংক্রমণ যে ছড়িয়ে পড়েছে সম্পর্কে সন্দেহ করার কোন অবকাশই ছিলনা। শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা সংক্রান্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কন্ট্রোল রুমের দেয়া তথ্যগুলো আমরা পর্যবেক্ষণ করি–

মাস / বছর	২০১৮	২০১৯	২০২০
জানুয়ারি	৬ হাজার ৭১২ জন	৭ হাজার ৫২০ জন	২৬ হাজার ৪৬১ জন
ফেব্রুয়ারি	৪ হাজার ১১৫ জন	৪ হাজার ৪৬০	২৪ হাজার ৯৫০ জন
মার্চ	১ হাজার ১০ জন	৮২০ জন	১১ হাজার ৯৩০ জন

তথ্যগুলো স্পষ্ট এই বার্তা দেয় যে শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণের রোগী বিগত দুই বছরের তুলনায় এ বছরের জানুয়ারি মাসে প্রায় সাড়ে তিনগুণ, ফেব্রুয়ারি মাসে প্রায় ৬ গুণ ও মার্চ মাসে প্রায় ১২ গুণ বেশি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও আইইডিসিআর এর উচিত ছিল এ বছরের জানুয়ারি মাস থেকেই শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণের তথ্য আরও নির্ভুলভাবে নেয়া এবং এজন্য একটি ডাটাবেজ জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে তৈরি করা। প্রতিটি সরকারি ও প্রাইভেট হাসপাতাল এবং প্রাইভেট প্র্যাকটিসিং ডাক্তারদের নির্দেশ দেয়া যে এ সংক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করলে তারা যেন সেটা ডাটাবেজে যুক্ত করেন। ডাটা এ্যানালাইজার নিয়োগ দিয়ে সেই ডাটাগুলো বিশ্লেষণ করে কোনখানে এই সংক্রমণ বেশি তা সুনির্দিষ্ট করা। একইসাথে একটা Respiratory servillance system দাঁড় করানো যার মাধ্যমে এই তথ্যগুলোর ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ জায়গাগুলো নির্দিষ্ট করা যায়।

এটা আমাদের কথা নয়। সার্স ও মার্স করোনা সংক্রমণের উপর ভিত্তি করে যে কোন নোবেল করোনা ভাইরাসের (নতুন জাতের করোনা ভাইরাস) সংক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যে 'ন্যাশনাল ক্যাপাসিটি রিভিউ টুল' তৈরি করেছে সেখানেই এগুলো দেয়া আছে।

ফলে যখন কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হয়ে গেছে, তখনও আমাদের কোন স্ক্রিনিং সিস্টেম, ডাটাবেজ তৈরি হয়নি। আমাদের Respiratory servillance system দাঁড়ায়নি। জাতীয় কিংবা বিভাগীয় পর্যায়ে কোন Rapid response team গড়ে উঠেনি, যারা এলার্ট আসা মাত্রই ওইসকল জায়গায় যেতে প্রস্তুত এবং কেস ম্যানেজমেন্ট ও কন্টাক্ট ট্রেসিংয়ের জন্য দক্ষতাসম্পন্ন।

স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে নতুন পরিস্থিতি মোকাবেলার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়নি

সেটার সামান্যতম চেষ্টাও হয়নি। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো স্বাস্থ্যব্যবস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে কোন টেবিল ওয়ার্কও ছিল না। এই রোগের ব্যাপারে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের শর্ট কোর্স ট্রেনিং প্রোগ্রাম আয়োজন করা দরকার ছিল। প্রতিরোধে জোর দেয়া দরকার সবচেয়ে বেশি। সেজন্য কী করতে হবে, কী করা যাবেনা- সেসব নিয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির দরকার ছিল। কোভিড ১৯ সংক্রমিত রোগী স্বাভাবিক থাকলে হাসপাতালে আসতে হয় না। সে আসে তখনই যখন তার শ্বাসকষ্ট বাড়ে, নিউমোনিয়া হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে প্রথমে অক্সিজেন দিয়ে ওয়ার্ডেই রোগীকে ম্যানেজ করা, আরও খারাপ হলে ভেন্টিলেশনে নেয়া- এর বাইরে আর কোন রাস্তা নেই। সেক্ষেত্রে অক্সিজেন সিলিন্ডারের প্রয়োজন পরিমাপ করে প্রস্তুত রাখা দরকার। আবার ভেন্টিলেশন কী পরিমাণ লাগতে পারে, কী পরিমাণ আছে, কয়টা আইসিইউ আছে, একজন প্রশিক্ষিত ডাক্তার কয়টা বেড ম্যানেজ করতে পারবে- এই পরিমাপ দরকারি ছিল। সংকটের সময় ভেন্টিলেটর কিনে ফেললে সমাধান হয়ে যাবে এটা ভাবা বোকামি। ভেন্টিলেটর পরিচালনা করতে সবাই পারে না। ভেন্টিলেটরে রোগীকে ঢোকাতে হলে ইনটিউবেশন করতে হয়। সেজন্য প্রশিক্ষিত লোক চাই। সেক্ষেত্রে শর্ট ট্রেনিং দিয়ে রেসপিরেটরি টেকনিশিয়ান তৈরি করা দরকার যারা ভেন্টিলেটর ম্যানেজ করতে পারবে। এসব কিছুই না করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রতি জেলায় আইসিইউ'সহ ২০০ বেড প্রস্তুত রেখেছেন-এসব কথা বলা মিথ্যা আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে উঠতেই স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে

আমাদের দেশে কোভিড ১৯ সনাক্ত রোগীর সংখ্যা এখনও ২ হাজার পার হয়নি। এরই মধ্যে স্বাস্থ্যব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও দুর্বলতা প্রকটভাবে দেখা যাচ্ছে। কোভিড ছাড়াও বিভিন্ন রোগের যেসকল ইমার্জেন্সি কেস আছে সেগুলো ম্যানেজ করার ক্ষেত্রে ঘাটতি, কোভিড ১৯ রোগীদের জন্য যেসকল হাসপাতাল নির্ধারিত আছে সেগুলোর চরম অব্যবস্থাপনা, প্রয়োজনীয় সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে না পারার কারণে প্রায় শতাধিক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর আক্রান্ত হওয়া, প্রথম এক মাস প্রতিদিন গড়ে মাত্র ৫১ জনকে পরীক্ষা করা- সবমিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা এখন যেমন করে বাড়ছে তাতে ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যব্যবস্থা এই ধাক্কা সামাল না দিতে পেরে হাত ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবে এ এখনই চোখ বন্ধ করে বলা যায়। এখনও কোনরকম নতুন পরিকল্পনা নেই, দ্রুতগতিতে পূর্বের ভুল সামলে নিয়ে এগোবার তাড়া নেই। সবচেয়ে বড় কথা 'ন্যাশনাল ক্যাপাসিটি রিভিউ টুল' এ Multidisciplinary Emergency Response Committee করার কথা আছে, সেটার ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। জাতীয় পর্যায়ে একটা সমন্বয় কমিটি করা হয়েছে কিন্তু তার কোন সক্রিয়তা দেখা যাচ্ছে না। ফলে সরকারের এমনকি স্বাস্থ্যব্যবস্থারও বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও এক অন্যকে দোষারোপ করার ঘটনাই ঘটে চলছে।

এই যদি চলতে থাকে তবে দেশের মানুষ কীভাবে রক্ষা পাবে? আর মানুষকে যদি রক্ষাই করা না গেল তবে এই স্বাস্থ্যব্যবস্থা থাকার অর্থই বা কী দাঁড়াবে? একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অবহেলায় মারা যাওয়ার পর এই কথাই বারবার উঠে আসছে যে, চিকিৎসা যতটুকু আছে তাকি শুধু হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক আর তাদের রক্ষাকারী আমলা ও রাজনীতিবিদদের জন্য? আইসিইউ বেড, এয়ার অ্যাম্বুলেন্স, আইসিইউ অ্যাম্বুলেন্স-এসব কি বড় বড় হোটেলে ডিনার টেবিলের মতো বুকিং দেয়া হয়ে গেছে?

শিয়ালবাড়ি বস্তির অগ্নিকাণ্ড-পরবর্তী সময়ে
বাসদ (মার্কসবাদী) মিরপুর-পল্লবী থানা শাখার বিক্ষোভ

মিরপুরে একর পর এক বস্তিতে অগ্নিকাণ্ড ঘটছে। বস্তিতে বাস করা নিম্ন আয়ের মানুষেরা খোলা আকাশের নিচে আশ্রয়হীন হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। প্রভাবশালী লোকের ভূমি-দখল করার চক্রান্তের অংশ হিসেবে এই অগ্নিকাণ্ডগুলো ঘটছে বলে ধারণা করা হয়। এর পূর্বেও রূপনগর বস্তি আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে। আশ্রয়হীন মানুষের পুনর্বাসন ও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্যে সরকারি উদ্যোগে কলোনি নির্মাণের দাবি জানিয়েছে বাসদ (মার্কসবাদী)। এসময়ে বস্তিবাসীদের মধ্যে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

করোনা মহামারির উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে কর্মহীন গৃহকর্মীদেরকে সরকারি উদ্যোগে রেশন ও বিশেষ ভাতা প্রদানের দাবিসহ ৪ দফা দাবিতে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে গৃহকর্মী অধিকার রক্ষা কমিটি চট্টগ্রাম জেলা। এ সময় নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলার সভাপতি আসমা আক্তার, সহ সভাপতি বেবী আক্তার, সাধারণ সম্পাদক আনজু আরা বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক রাশেদা বেগম ও সদস্য কোহিনূর বেগম।

সাম্যবাদ

কিউবা কেন পারে

ভিডিওটি অনেকেই দেখেছেন। ইতালির বিমানন্দরে নেমেছে কিউবার ৫৩ সদস্যের মেডিকেল ব্রিগেড। মুহুর্মূহু করতালি দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে বিমানবন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। ইতালি তখন মৃত্যুপুরী। কোভিড ১৯ আক্রান্ত হয়ে ইউরোপের সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হচ্ছে তখন ইতালিতে। মেডিকেল ব্রিগেড চলে গেল একেবারে লোম্বার্ডি এলাকায়, যেটি তখন ইতালির 'এপিডেমিক এপিসেন্টার'। শুধু ইতালি নয়, এই মুহূর্তে কিউবার মেডিকেল ব্রিগেডের প্রায় ৫০,০০০ ডাক্তার পৃথিবীর প্রায় ৬৭টি দেশে মানুষের সেবা করছে, যা সম্মিলিতভাবে জি-৭ ভুক্ত দেশগুলোর থেকে বেশি। শুধু কোভিড ১৯ মহামারী রোধে ১৪ টি দেশে তাদের মেডিকেল ব্রিগেড কাজ করছে।

এর কাজের ওজনটা শুধু এই তথ্য দিয়ে বোঝা যাবে না। ব্রাজিলের প্রাক্তণ প্রেসিডেন্ট লুলা ডি সিলভা বলেছেন, 'যারা কিউবাকে বছরের পর বছর ধরে অর্থনৈতিক অবরোধের মধ্যে রাখলো, আজ কিউবা তাদের পাশেই দাঁড়িয়েছে। এটা সে দেশগুলোর মানুষের প্রতি কিউবার ভ্রাতৃত্বমূলক আচরণ এবং একইসাথে অত্যন্ত গৌরবেরও।' ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বিরোধীদলীয় নেতা জেরেমি করবিন বললেন, 'ইতালির পাশে দাঁড়িয়ে কিউবার চিকিৎসকরা আন্তর্জাতিকতাবাদের যে দৃষ্টান্ত দেখালো তা আমাদের জন্য খুবই উদ্দীপনামূলক। এর মধ্য দিয়ে কিউবা গোটা পৃথিবীর সামনে বড় হল।'

আন্তর্জাতিকভাবে তখন থেকেই আলোচনাটা শুরু হয়েছিল, যখন মার্চে ইংল্যান্ডের এম এস ব্রেইমার নামক একটি জাহাজ ৫ জন করোনা আক্রান্ত রোগী নিয়ে ভাসছিল ক্যারিবিয়ান সাগরে, কোনো দেশ তাদের আশ্রয় দিচ্ছিল না। সেসময় নিজ দেশের বন্দর খুলে দিয়েছিল মানবিক দেশ কিউবা। তারা অসুস্থদের চিকিৎসা করল, অন্য যাত্রীদের দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে দিল। পত্রিকায় এসেছে কীভাবে কিউবার ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মীরা মানুষের ঘরে ঘরে ছুটছে করোনা রোগী শনাক্ত, চিকিৎসা, সচেতন করার জন্য। যদিও এ কাজ তাদের স্বাভাবিক সময়েও নিয়মিত করতে হয়। করোনা মোকাবিলায় জানুয়ারি মাস থেকেই সরকার, কমিউনিস্ট পার্টি, ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, বিশেষজ্ঞ-গবেষক, জনগণ মিলে এক সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তারা প্রধানত জোর দেয় ঘরে ঘরে তথ্য সংগ্রহের উপর। এটাকেই বলে স্ক্রিনিং যা আমাদের দেশসহ কোনদেশেই সঠিকভাবে করা হয়নি। এখান থেকে করোনা উপসর্গ যুক্ত রোগী, বিদেশফেরত বা বিদেশিদের সংস্পর্শে আসা লোকদের আলাদা করে চিকিৎসা ও আইসোলেশনের ব্যবস্থা করে। এরপর উপসর্গ দেখা লোকজনকে ব্যাপক পরীক্ষার আওতায় নিয়ে আসে। এটা ছিল কিউবার সংক্রমণ পূর্ববর্তী প্রস্তুতি।

এর মধ্যে ১১ মার্চ বেড়াতে আসা একজন ইতালির নাগরিকের দেহে করোনা ভাইরাস পাওয়া যায়। এরপর সীমান্ত বন্ধ ও লকডাউনের ঘোষণা দেয়া হয়। দেশটি এসময় সবচেয়ে বেশি নির্ভর করছে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উপর।

স্বাস্থ্যব্যবস্থার বুনিয়াদী জায়গা যদি ঠিক না হয় তাহলে কোন দেশ হঠাৎ করে কিছু করতে পারে না। কিউবার এই করতে পারার পেছনে তার সুপরিকল্পিত স্বাস্থ্যব্যবস্থাটিকে বুঝতে হবে। কিউবা তার সীমিত সম্পদ দিয়েও দেশের সকল মানুষের জন্য বিনা খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। কিউবা রোগ হওয়ার পর চিকিৎসা করার চেয়ে প্রতিরোধমূলক চিকিৎসার উপর জোর দেয়। তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সারাদেশে তাদের রয়েছে অনেকগুলো বেসিক চিকিৎসা টিম। এসব টিমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, চিকিৎসক, নার্স ও প্যারামেডিকরা থাকেন যারা একটি এলাকার ১২০-১৫০টি পরিবারের স্বাস্থ্যসেবার দায়িত্ব পালন করেন। এ টিম নিয়মিত বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের স্বাস্থ্য ও তার পরিবেশের খোঁজখবর নেয়। কেউ অসুস্থ হলে এ টিমের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া পলিক্লিনিক, হাসপাতাল, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মেডিকেল কলেজ-এর সমন্বয়ে সারাদেশ জুড়ে তাদের রয়েছে একটা বিস্তৃত চিকিৎসা নেটওয়ার্ক। যার আওতায় রয়েছে দেশের প্রত্যেকটি মানুষ। আর এ ব্যবস্থাকে কার্যকর রাখতে মেডিকেল কলেজসহ ২১ ধরনের মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তারা গড়ে তুলেছেন। এগুলো থেকে প্রতিবছর হাজার হাজার ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী শিক্ষা লাভ করছে, যার মধ্যে অনেক বিদেশী শিক্ষার্থীও রয়েছে। বলা বাহুল্য তাদের শিক্ষাব্যবস্থাও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পরিচালিত। কিউবা এখন সারাবিশ্বে প্রতি হাজার মানুষের জন্য ডাক্তারের সংখ্যায় প্রথম স্থানে রয়েছে। কিউবাতে প্রতি হাজার মানুষের জন্য ডাক্তার আছে ৮ জন, সেখানে আমেরিকায় আছে ২ জন, আমাদের দেশে দুই হাজারে ১ জন। তারা দেশ ও পৃথিবীর মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গড়ে তুলেছে সেরা গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কিউবার সেন্টার ফর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি সফলভাবে হেপাটাইটিস-বি প্রতিষেধক ও মেনিনগোকোক্কাল ব্যাকটেরিয়ার প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছে। তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন ঔষধ সার্স, ইবোলা ভাইরাস প্রতিরোধে ভূমিকা রেখেছে। করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় চীন কিউবার উৎপাদিত 'ইন্টারফেরন আলফা ২বি' ব্যবহারে সুফল পেয়েছে। মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় এসব পদক্ষেপের ফলে কিউবায় গড় আয়ু, শিশু মৃত্যু, প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্যসহ সবগুলো স্বাস্থ্যসূচকে দুনিয়ার সকল দেশকে টপকে গিয়েছে।

কিউবা সবগুলো দুর্যোগেই মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। ২০০৫ সালে পাকিস্তানের ভুমিকম্পে, ২০১০ সালে হাইতির কলেরা মহামারিতে, ২০১৪ সালে আফ্রিকার পশ্চিমাংশে ইবোলা ভাইরাস সংক্রমণে তাদের মেডিকেল ব্রিগেড ছিল সম্মুখসারির যোদ্ধা। এগুলো কোনটাই তাদের দেশে হয়নি, কিন্তু তারা এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করার কারণে যে আন্তর্জাতিকতাবাদের চেতনা গোটা দেশের জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রকাশ এই সহযোগিতা। এই কারণে কিউবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রুনো রুদ্রিগেজ যখন International cooperation এর কথা বলছেন, তখন মহাশক্তিধর মহাপ্রতাপশালী দেশগুলোর কর্তারা তাকিয়ে আছেন multinational corporation এর দিকে।

বাসদ (মার্কসবাদী)'র উদ্যোগে 'হ্যান্ডওয়াশ কর্নার'

ঢাকা

রংপুর

ফেনী

বাসদ (মার্কসবাদী)'র উদ্যোগে ত্রাণ তৎপরতা

গাইবান্ধা

মিরপুর, ঢাকা

কুড়িগ্রাম

চট্টগ্রাম

কড়াইল, ঢাকা

চাঁদপুর

ময়মনসিংহ

সিলেট

রংপুর

গাজীপুর

কিশোরগঞ্জ

কড়াইল, ঢাকা

সাম্যবাদ

সচেতনতা কার্যক্রম

শাবিপ্রবি

গাইবান্ধা

পল্টন, ঢাকা

ফেনী

মিরপুর, ঢাকা

চট্টগ্রাম

গাইবান্ধা

সিলেট

প্রগতিশীল ছাত্র জোটের

প্রতীকী বিক্ষোভ

নিম্নবিত্ত-শ্রমজীবী মানুষের কাছে ত্রাণ সরবরাহ ও আর্থিক সহযোগিতা নিশ্চিত করণ; ত্রাণ সামগ্রী লুটপাটের সাথে জড়িতদের শাস্তি নিশ্চিত প্রদান; ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা ও চিকিৎসা কার্যক্রম সচল রাখতে পর্যাপ্ত পিপিই-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট-ঔষধ সরবরাহের দাবিতে প্রগতিশীল ছাত্র জোটের উদ্যোগে ১৮ এপ্রিল শাহবাগে প্রতীকী বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ছাত্র জোটের সমন্বয়ক ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি মাসুদ রানা। এর সাথে সংহতি জানিয়ে সারা দেশে অসংখ্য শিক্ষার্থী-অভিভাবক অনলাইনে প্রতিবাদ জানান।

অনলাইনে বিক্ষোভের কিছু চিত্র

জেলায় জেলায় স্মারকলিপি পেশ

করোনা প্রতিরোধে সময়মতো ব্যবস্থা গ্রহণে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট স্মারকলিপি পেশের কয়েকটি চিত্র।
দেশে করোনা সংক্রমণের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই ধারাবাহিকভাবে বাসদ (মার্কসবাদী)'র বিভিন্ন জেলার পক্ষ থেকে করোনা টেস্টের জন্য সারাদেশে পর্যাপ্ত ল্যাব স্থাপন, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্যে পর্যাপ্ত পিপিই নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি দাবিতে সিভিল সার্জনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

ফেনী

সিলেট

চাঁদপুর

ঢাকা

চট্টগ্রাম

গাইবান্ধা

ময়মনসিংহ

নোয়াখালী

রংপুর

সাম্যবাদ

শেষ পৃষ্ঠা

এপ্রিল ২০২০

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

করোনা মহামারী প্রতিরোধে যুদ্ধকালীন তৎপরতা চাই

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

প্রথম থেকেই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার করোনা ভাইরাস মোকাবেলাকে গুরুত্ব দেয়নি, বরং সরকারের মন্ত্রীরা 'যথেষ্ট প্রস্তুতি আছে', 'প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে' ইত্যাদি বাগাড়ম্বর ও মিথ্যাচার করেছে।

বাসদ (মার্কসবাদী) সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ দ্রুত গতিতে বাড়ার আশঙ্কায় আগে থেকেই সরকারকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে আসছেন। গত ১৯ মার্চ এক বিবৃতিতে তিনি করোনা মোকাবেলায় সরকারের অপর্যাপ্ত প্রস্তুতি-অব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়হীনতায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে অবিলম্বে যুদ্ধকালীন তৎপরতা শুরু করতে সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, "সারা বিশ্বেই করোনা ভাইরাসজনিত কোভিড-১৯ রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ছে এবং আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। বাংলাদেশেও সরকারী ভাষ্য অনুসারে এখন পর্যন্ত ১৪ জন করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তি সনাক্ত হয়েছে এবং একজন মারা গিয়েছেন। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে খুব দ্রুত করোনা ভাইরাস ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে এ ভাইরাস ঠেকাতে দেশগুলোকে এখনই কঠোর পদক্ষেপ নিতে বলেছে। ডিসেম্বরে চীনে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়ার পর আমরা দুইমাস সময় পেয়েছি যথাযথ প্রস্তুতি নেওয়ার। কিন্তু প্রথম থেকেই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার করোনা ভাইরাস মোকাবেলাকে গুরুত্ব দেয়নি, বরং সরকারের মন্ত্রীরা 'যথেষ্ট প্রস্তুতি আছে', 'প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে' ইত্যাদি বাগাড়ম্বর ও মিথ্যাচার করেছে। এখন মানুষের কাছে স্পষ্ট – প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়া হয়নি। গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও সতর্কীকরণের ওপর যত জোর দেয়া হচ্ছে, সে তুলনায় সম্ভাব্য রোগাক্রান্ত প্রত্যেকের বিনামূল্যে পরীক্ষা, রোগ নিরূপণ ও চিকিৎসার জন্য সরকারি পদক্ষেপ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। গত এক মাসে প্রায় চার লাখ নব্বই হাজারের মতো প্রবাসী দেশে ফিরলেও, বেশিরভাগই পরীক্ষার বাইরে থেকে গিয়েছেন। বিদেশফেরতদের হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার কথা বলা হলেও, তা নিশ্চিত করার সরকারি উদ্যোগ ছিল না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, করোনা মহামারির প্রকোপ কমিয়ে আনতে সন্দেহভাজন রোগীদের পরীক্ষা ও আক্রান্তদের আইসোলেশনে নেয়ার কোন বিকল্প নেই। অথচ ঢাকায় একটি কেন্দ্র ছাড়া আর কোন জেলাতেই করোনা ভাইরাস পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই, ১৬ কোটি মানুষের জন্য সরকারের হাতে মাত্র ১৭৩২টি কিট আছে। হাসপাতালগুলোতে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও নিরাপত্তা সরঞ্জাম প্রদান করা হয়নি। ফলে আতঙ্ক ও সমন্বয়হীনতার কারণে সম্ভাব্য রোগীদের সরকারী-বেসরকারী কোনো হাসপাতালে ভর্তি বা চিকিৎসা করা হচ্ছে না এবং দীর্ঘসূত্রিতার কারণে মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। ব্যাপক আকারে সংক্রমণ দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ভেন্টিলেশন যন্ত্র, রোগী বহনের জন্য বিশেষ এম্বুলেন্স, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল; কোনো এলাকা বা পুরো শহর কোয়ারেন্টিন বা 'লক ডাউন' করতে হলে তার ব্যবস্থাপনা-চিকিৎসা-খাদ্য সরবরাহ ইত্যাদি জরুরী বিষয় কিভাবে মোকাবেলা করা হবে, সে বিষয়ে জনগণকে আশ্বস্ত করার মতো প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা সরকারের নেই। বরং সরকারের সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ মুজিববর্ষ পালনের নামে শত শত কোটি টাকার আলোকসজ্জা ও আতশবাজির উৎসবের দিকে। জনমনে আতংকের সুযোগে ব্যবসায়ীরা মাস্ক, স্যানিটাইজারসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে মুনাফা লুটছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করলেও, কারখানা-অফিস-কর্মক্ষেত্র-শপিং মল ও জনসমাগমের স্থানগুলো সবই চালু আছে। এসব জায়গায় সাবান-মাস্ক-হ্যান্ড স্যানিটাইজারসহ প্রতিরোধমূলক ও জীবাণুমুক্তকরণ ব্যবস্থা যথেষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

আমরা শংকিত – ঘনবসতিপূর্ণ এই দেশে সংক্রমণ প্রতিরোধে যথেষ্ট ব্যবস্থা নেয়া না হলে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে বহু মানুষের প্রাণ যেতে পারে। জনমনে এই উদ্বেগ ও অসহায়ত্বের পরিস্থিতিতে আমরা সরকারের কাছে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেয়ার দাবি জানাই –

১. জরুরী পরিস্থিতি বিবেচনায় ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মী-হাসপাতালের সংখ্যা বাড়াতে হবে। প্রত্যেক জেলায় করোনা পরীক্ষার সেন্টার ও বিনামূল্যে টেস্ট করার ব্যবস্থা করতে হবে। অবিলম্বে বিদেশ থেকে পরীক্ষার কিট আমদানি ও দেশের ভেতর উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা সরঞ্জাম ও ট্রেনিং নিশ্চিত করতে হবে।

২. বিদেশফেরতদের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টিন ও করোনা টেস্ট করতে হবে। তাদের সংস্পর্শে যারা আসছেন তাদের পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। সরকারী উদ্যোগে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. কোয়ারেন্টিনে থাকাকালীন ফর্মাল সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য সবেতন ছুটি ও ইনফর্মাল সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য বিশেষ ভাতা ও পরিবারের জন্য রেশন বরাদ্দ করুন। হকার-ছোট দোকানদার-রিক্শাচালক-দিনমজুর যাদের কাজ ও রোজগার বন্ধ, সেই সব গরিব-নিম্নবিত্ত পরিবারে অন্তত সামনের চার সপ্তাহ বিনামূল্যে রেশন, খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করতে হবে।

৪.সাবান-মাস্ক-হ্যান্ড স্যানিটাইজারসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের কালোবাজারী ও মূল্যবৃদ্ধি বন্ধ কর। গরিব এলাকাগুলোতে সরকারি খরচে সাবান-মাস্ক বিতরণ করতে হবে।

৫. সারাদেশের বিশিষ্ট চিকিৎসক, চিকিৎসক সংগঠন ও বিজ্ঞানীদের নিয়ে সভা করে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করা এবং চীন-দক্ষিণ কোরিয়া-ইতালি-কিউবাসহ বিভিন্ন দেশ যেভাবে এই মহামারী মোকাবেলা করেছে তাদের অভিজ্ঞতা ও সহযোগিতা গ্রহণ করুন।

সরকারের কাছে যুদ্ধকালীন তৎপরতার দাবি জানানোর পাশাপাশি জনসাধারণের প্রতি আমরা আবেদন জানাই–মহামারী প্রতিরোধে নিজেরা সতর্ক থাকুন, অন্যদের সচেতন করুন ও আক্রান্ত মানুষের প্রতি সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিন। সমস্ত রাজনৈতিক দল-গণসংগঠন-ক্লাব-লাইব্রেরি-সমিতি-স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সকলে বিপদাপন্ন মানুষকে রক্ষায় এগিয়ে আসুন।"

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে এই বিক্ষোভ বিস্ফোরণে পরিণত হবে

বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জহিরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক উজ্জল রায় এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, গোটা দেশের শ্রমিকদের সাথে সরকার পরিহাস করছে। গোটা দেশে ৬ কোটি শ্রমিকের মধ্যে ৫ কোটিই কাজ করে অসংগঠিত সেক্টরে। এদের সবার কাজ এখন বন্ধ। এরা এখন পুরোপুরিভাবে সরকারি ত্রাণের উপর নির্ভরশীল। এদের পরিবারের সদস্যরা অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। অথচ কোনো সহযোগিতা তারা পাচ্ছে না। এদের কোনো তালিকা সরকারের কাছে নেই। তালিকা তৈরি করার উদ্যোগও নেই। লক-ডাউনের মধ্যে তারা খাবারের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাইরে বের হওয়ার কারণে আবার পুলিশের মার খাচ্ছে। অনেকে গ্রামে গেছে। কিন্তু গ্রামেও একই অবস্থা। আবার শহরে ছিটেফোঁটা যা ত্রাণ আসছে সেটাও এলাকার ভোটার না হলে দেয়া হচ্ছে না। শহরে কাজ করা একটা বিরাট অংশের শ্রমিকরা কেউ-ই সেখানকার ভোটার নয়। ফলে তারা তাও পাচ্ছে না। দুর্যোগের সময় ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে এ ধরনের বিভাজন কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

আবার প্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরে যত শ্রমিক কাজ করে তার সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কাজ করে গার্মেন্টস সেক্টরে। সেখানেও ঘোষণা দেয়ার পর, নামমাত্র সুদে সরকারি ঋণ দেয়ার পরও বেতন দেয়া হচ্ছে না। বরং বেআইনিভাবে তাদের ছাঁটাই করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে বিজিএমইএ'র পক্ষ থেকে 'লে-অফ' এর ঘোষণা দেয়ার জন্য কারখানা ও পোশাক পরিদর্শন অধিদপ্তরে আবেদন জানানো হয়েছে। বাস্তবে এটা শ্রমিক ছাঁটাইয়ের একটা প্রস্তুতি। ৪৫ দিনের বেশি 'লে-অফ' থাকলে শ্রমিককে ছাঁটাই করার ক্ষেত্রে মালিকের কোনো আইনি বাধা থাকে না। দশ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের একটা অনানুষ্ঠানিক ঘোষণা তারা ইতোমধ্যে দিয়ে রেখেছেন। যদিও বিজিএমইএ-র ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে ছাঁটাই নয়, দশ লক্ষ শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে বা তাদের উপরে এই দুর্যোগের প্রভাব পড়বে। কিন্তু এই প্রভাব পড়ার নমুনা আমরা গত কয়েকদিনেই দেখেছি। প্রধানমন্ত্রীর সাথে ভিডিও কনফারেন্সে গাজীপুরের পুলিশ সুপার বলেছেন, অনেক শ্রমিককে বেতন দেয়ার কথা বলে ঢাকায় আনা হয়েছে। কিন্তু বেতন তারা পাননি। এখন এরা ঢাকায় এসে আটকে পড়েছেন। অনেক মালিক পিপিই তৈরির কথা বলে কারখানা খোলা রেখে অন্য কাজ করাচ্ছেন। ঢাকায় এসে বেতন না পেয়ে তারা উপোস করছেন। অনেকে ত্রাণের জন্য ভিড় করছেন, কিন্তু ত্রাণ পাচ্ছেন না। অসংগঠিত সেক্টরের ৫ কোটি শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৭৩০ কোটি টাকা। এ অবস্থা চলতে থাকলে কোভিড-১৯ এর কারণে নয়, খাবারের অভাবে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক মারা যাবে।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন বাগানে কাজ বন্ধ রাখার কথা দাবি জানিয়েছে। কিন্তু দুঃখের সাথে আমরা লক্ষ করছি যে, অনেক বাগানে শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। কোন সেক্টরেই শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে, বেতনের ব্যাপারে মালিকরা কোন কথাই গ্রাহ্য করছেন না। সরকারও সবক্ষেত্রে মালিকদেরই সমর্থন করছেন।

এ অবস্থা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, রাষ্ট্র মানে একটা শ্রেণিবিভক্ত রাষ্ট্র এবং সেটা কোন না কোন শ্রেণির পক্ষে কাজ করে–এই কথাটা কত নির্মম সত্য। কোনো সংকট, কোনো দুর্যোগ, কোনো মহামারীতেই এর বাইরে রাষ্ট্র অবস্থান নিতে পারে না। আমরা সরকারকে আহবান জানাই ছয় কোটি শ্রমিকসহ তাদের পরিবারকে এই দুর্যোগে রক্ষা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন, তা না হলে এই বিক্ষোভ বিস্ফোরণে পরিণত হবে।

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি: মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত। ফোন ও ফ্যাক্স: ৯৫৭৬৩৭৩।
ওয়েবসাইট: www.spbm.org; ই-মেইল: mail@spbm.org